স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ সম্ভার

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ঃ

স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্বাস্থ্য বিধিপালন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পরিবেশ সচেতনতা গঠন।

কর্মশালা প্রকরণ-নির্দেশিকা (মডিউল) ঃ অষ্টম

স্বাস্থ্য শিক্ষা ঃ

স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্বাস্থ্য বিধিপালন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পরিবেশ সচেতনতা গঠন

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রথম সংস্করণ ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ২০০৩

প্রকাশক
অধ্যাপক স্বপন কুমার সরকার, সচিব
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
৮৪, শরৎ বসু রোড
কলকাতা - ৭০০০২৬
দূরভাষ ঃ ২৪৭৪-৭৬৯৭

মুদ্রণ
নিউ স্কুল বুক প্রেস
৩/২ ডিক্সন লেন
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
২২২৭-১৬৫৬/০০১১

কর্মশালা প্রকরণ-নির্দেশিকা (মডিউল) ঃ অষ্টম

রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ
প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত

স্বাস্থ্য শিক্ষা ঃ

স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্বাস্থ্য বিধিপালন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পরিবেশ সচেতনতা গঠন

সহযোগিতায় ঃ

রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা, ইউনিসেফ, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-গবেষণা ও
প্রশিক্ষণ পরিষদ, রাজ্য শিক্ষা অধিকার, পঃ বঃ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ
ও রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

৮৪, শরৎ বসু রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬

স্বাস্থ্য শিক্ষা
(কর্মশালা প্রকরণ-নির্দেশিকা)

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ নির্দেশিকার প্রকাশনা

জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের মঞ্চ থেকে একটি আওয়াজ প্রায়শই ধ্বনিত হয়ে থাকে – "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল মানুষ আর মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তার স্বাস্থ্য"। প্রকৃতপক্ষে মানব সম্পদের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য এবং দেশের ও সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান হল শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। অথচ আমাদের দেশের জনসাধারণের একটা উল্লেখ্য অংশ (প্রায় ৩৫ শতাংশ) যেমন আজও অশিক্ষার অন্ধকারে, তেমনই একটা অনুপেক্ষণীয় অংশ স্বাস্থ্যহীনতারও শিকার, অনেকক্ষেত্রেই স্রেফ অজ্ঞতার জন্য, স্বাস্থ্যচেতনা ও শিক্ষার অভাবেই। সুতরাং 'সকলের জন্য শিক্ষা' ও 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এই আহ্বান একই সঙ্গে ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন এবং এই ধ্বনি বাস্তবায়িত করতে অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের সাধ্যমত এবং সমন্বিতভাবে প্রয়াসী হতে হবে। এই দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই শিশুদের উপরই সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত – অর্থাৎ সকল শিশুর জন্য শিক্ষা ও তাদের সকলের জন্য স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণ প্রয়োজন, কারণ আজকের শিশুকেই ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং দেশের উন্নয়নে যোগ্য ভূমিকা পালনে সমর্থ করে তুলতে হবে। জীবনের শুরু থেকেই অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতার শিকার হলে সেই শিশুর পক্ষে পরবর্তীকালে দেশ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ দুষ্কর হয়ে উঠতে পারে। আবার স্বাস্থ্যহীন শিশুর কাছে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন বা আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সব কিছুই নিরানন্দময় হয়ে উঠতে পারে যা আদৌ কাম্য নয়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাঝপথেই বিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়া (drop-out) বা বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হতে না পারার অন্যতম কারণ যে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যহীনতাও হতে পারে সে সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং একদিকে যেমন সকল শিশুকে শিক্ষালয়ে নিয়ে আসতে হবে, তেমনই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে সবিশেষ লক্ষ রাখা দরকার। মূলত এদিকে লক্ষ রেখেই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রচলনের প্রয়াস। এই কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে ভারতে শিশু স্বাস্থ্যের সামগ্রিক চালচিত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কয়েকটি নির্দেশকের দিকে একটু দৃকপাত করা যেতে পারে। ভারতে এখনও নবজাত শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে গড়ে ৭০ জন, কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে এই হার বিভিন্ন রকম (যেমন, কেরালায় ১৪ জন, আবার ওড়িশায় ৯৭ জন), ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ৯৫ শতাংশ (পশ্চিমবঙ্গে যদিও ৭০ শতাংশের নীচে), প্রসূতি মৃত্যুর হার ভারতে এখনও সুউচ্চ (প্রতি লাখে প্রায় ৫১০ জন), ভারতে শিশুদের প্রায় ৪৭ শতাংশ কম ওজনের (পুষ্টিহীনতার জন্য)। ভারতে জনসাধারণের প্রায় ২০ শতাংশ এখনও উন্নত জল সরবরাহের সুযোগ পান না, প্রায় ৬৪ শতাংশই শৌচাগারের সুযোগ পান না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে এসব বিষয়ে অবস্থা শোচনীয়তর সেটি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। যেসব রোগ ব্যাধিতে ভারতে শিশুরা সাধারণভাবে বেশি করে আক্রান্ত হয় সেগুলির কয়েকটি হল ঃ অ্যানিমিয়া (প্রায় ৭৪% শিশু – মূলত পুষ্টিহীনতার জন্য), ভিটামিন – 'এ' র অভাব জনিত রোগ ব্যাধি (যার মধ্যে রাতকানা রোগ অন্যতম), লবণে আয়োডিনের অভাব জনিত রোগ (যেমন, গলগন্ড), জলবাহিত রোগ (আমাশয়, ডায়েরিয়া, কলেরা, ফিতাক্রিমি, খোসপাঁচড়া ইত্যাদি – মূলত নিরাপদ জলের অলভ্যতা ও সঠিকভাবে জল ব্যবহারের অজ্ঞতার জন্য)। এছাড়াও বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির (যেমন ম্যালেরিয়া) শিকারও কম শিশু নয়!

এসব বিষয় মনে রেখেই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে মূলত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করবার কথা ভাবা হয়েছে ঃ

ক) চিকিৎসক/চিকিৎসাকর্মীদের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের নিবিড় স্বাস্থ্য পরীক্ষা – বছরে অন্তত দুইবার – স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সংগঠনের মাধ্যমে (বিদ্যালয় গুচ্ছ স্তরে, চক্রস্তর থেকে শুরু করে সমগ্র জেলার প্রতিটি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র সহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য)।

খ) সঠিক পরিকল্পনা মাফিক গোটা রাজ্যব্যাপী প্রাথমিকস্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ/অভিমুখীকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তাঁদের দ্বারাই বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে (রুটিন মাফিক) ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষার (শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যের) ব্যবস্থা গ্রহণ, পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধকরণ, জটিল ক্ষেত্রে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অবহিত করণ এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহায্যে পরবর্তী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ (এজন্য রেফারাল কার্ডের ব্যবস্থাকরণ)।

গ) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি পালনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, শারীরশিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা এসবের জন্যও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচিটির যথাযথ এবং নিরবচ্ছিন্ন রূপায়ণ সম্ভব কেবলমাত্র সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই। বিশেষভাবে সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ এবং পঞ্চায়েত বিভাগের কার্যকর সমন্বয় গড়ে তুলতে না পারলে এ বিষয়ে সফল হওয়া যাবে না। এছাড়াও (সর্বশিক্ষা

অভিযানের দায়িত্বপ্রাপ্ত) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা, ইউনিসেফ এসব প্রতিষ্ঠানেরও সক্রিয় সহযোগিতা কর্মসূচিটির সফল রূপায়ণের জন্য অত্যাবশ্যক। সবশেষে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সঙ্গে গণউদ্যোগের সংযোগও এ বিষয়ে সাফল্যের চাবিকাঠি, তাই বিশেষ করে স্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহকেও এই কর্মসূচি রূপায়ণে জড়িয়ে নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সমন্বিতভাবে ব্যাপ্তস্তরীয় (macro-level) এবং অণুস্তরীয় (micro-level) উভয় ধারার মাধ্যমেই কর্মসূচিটির রূপায়ণে অগ্রসর হতে চায়।

ব্যাপ্তস্তরীয় কর্মধারায় পর্যায়ক্রমিকভাবে (cascade mode এ) প্রধানতম সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের অবহিতকরণ, জেলাস্তরের মুখ্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের (key resource persons) অভিমুখীকরণ, জেলাস্তরে সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ও পরিশেষে চক্রস্তরে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রশিক্ষণ/অভিমুখীকরণ সম্পন্ন করতে চায়। এগুলির মধ্যে প্রথম দুটি পর্যায় কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্যস্তরে বা অঞ্চল/বিভাগ ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। পরের দুটি পর্যায় নির্দিষ্ট জেলাগুলিতেই সম্পাদিত হবে। প্রতি পর্যায়েই আলোচ্য প্রশিক্ষণ-সম্ভার বা মডিউলটি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।

অণুস্তরীয় পরিকল্পনায় বিদ্যালয়-ভিত্তিক বা গ্রাম/ওয়ার্ড ভিত্তিক, চক্রভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং এই পরিকল্পনায় মা ও শিশু সমিতি, গ্রাম /ওয়ার্ড- শিক্ষা কমিটি, পঞ্চায়েত/ পুরসভা, চক্রস্তরীয় সম্পদ কেন্দ্রগুলি – এসবকেই উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। সম্ভব হলে বিভিন্নস্তরেই হেল্‌থ ক্লাব বা স্বাস্থ্য কমিটি গড়ে তোলা যেতে পারে। স্বাস্থ্য আন্দোলনে ব্রতী বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জেলার বিভিন্ন এলাকার বিদ্যালয়গুলির স্বাস্থ্য কর্মসূচির দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি সফল করতে গেলে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া অবশ্যই জরুরি। অর্থাৎ, প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিরাপদ জলের ব্যবস্থা, উপযুক্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা, কলুষমুক্ত পরিবেশ, বিদ্যালয় পুষ্টি প্রকল্প, বিদ্যালয়ে খেলাধুলার ব্যবস্থা এসব সুযোগ লভ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় (সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচিতে এসব কিছুরই সুযোগ রাখা হয়েছে, সেই পরিকল্পনা দ্রুত রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন)।

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি রূপায়ণ সম্পর্কিত এই প্রশিক্ষণ-সম্ভারটি (training-package বা module) প্রণীত হয়েছে বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞগণের উপস্থিতিতে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত কর্মশালা এবং বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাগুচ্ছের মাধ্যমে। এই সব প্রতিষ্ঠান ও কর্মশালা এবং বিভিন্ন আলোচনায় উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের যাঁদের সম্মিলিত ভাবনার ফসল এই প্রশিক্ষণ –সম্ভার ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির পরিকল্পনা তাঁদের সকলকে জানাই অভিনন্দন। তাঁদের সকলের কাছেই জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনের প্রাক্তন ও বর্তমান অধিকর্তা যথাক্রমে ডাঃ অমিয় কুমার হাটি ও ডাঃ হিরন্ময় মুখার্জী এর প্রতি। এঁদের প্রদত্ত কিছু মূল্যবান তথ্য এই প্রকাশনায় ব্যবহারের সুযোগ দেবার জন্য এবং ডাঃ হাটি সম্পূর্ণ প্রকাশনাটি খুঁটিয়ে দেখে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ দেবার জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সম্ভারটি প্রস্তুতিতে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের পরিবার কল্যাণ বিভাগস্থ স্কুল হেলথ বিভাগ প্রণীত মডিউল (যেটি রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা (বিদ্যালয় স্বাস্থ্য) বিভাগ কর্তৃক অনুবাদিত) – সেটির সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

এই প্রকাশনাটি যদিও মূলত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিমুখীকরণের দিকে লক্ষ রেখেই প্রণীত, তবুও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির সঙ্গে যাঁরা জড়িত থাকবেন তাঁরা সকলেই এই সম্ভারটির সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন এবং আমাদের প্রত্যাশা প্রকাশনাটি বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনার (সর্বস্তরের) ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান আকরগ্রন্থ (source-book) হিসেবে গণ্য হবে।

সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির এই পরিকল্পনা সফল ও সমাজের স্বাস্থ্য চেতনা উন্মেষের ব্যাপকতর উদ্দেশ্যসাধক হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশা ও প্রত্যয় ব্যক্ত করে এই কলম শেষ করছি।

ডঃ জ্যোতি প্রকাশ ঘোষ

সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাথমিক বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য প্রকল্প

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের কয়েকটি উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা যায় ঃ

১। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা।

২। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং নিয়মিত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি পালনে ছাত্রছাত্রীদের সমর্থ করে তোলা।

৩। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ভুল ধারণা দূর করা।

৪। খেলাধুলা, শারীর শিক্ষা, যোগ ব্যায়াম এসবের সঙ্গে স্বাস্থ্যশিক্ষাকে সমন্বিতকরে শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

৫। বিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা।

৬। সাধারণ রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়েই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৭। ছাত্রছাত্রীদের (এবং তাদের অভিভাবকদেরকেও) সস্তায় পুষ্টি এবং সুষম খাদ্যের লভ্যতা সম্পর্কে অবহিত করা; সম্ভব হলে বিদ্যালয়েই পুষ্টির ব্যবস্থা করা।

৮। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত ও সুন্দর করে তোলা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৯। চিকিৎসক/চিকিৎসাকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক, পঞ্চায়েত, জনপ্রতিনিধি এঁদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে এই কর্মসূচিকে অর্থবহ ব্যাপক উদ্দেশ্যসাধক ও সম্পূর্ণ সাফল্যমন্ডিত করে তোলা।

১০।সচেতন শিক্ষিকা-শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বিতভাবে এবং সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের ব্যাপক অংশের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হওয়া।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষিকা-শিক্ষক এবং অন্যেরা কী করবেন

কর্ম তালিকা – ১

গ্রুপ-ভিত্তিক আলোচনা করুন যে উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখিত হয়েছে আপনাদের এলাকার বিদ্যালয়সমূহে ঐগুলির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি, উদ্দেশ্যগুলি পূরণে সম্ভাব্য কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে এবং কীভাবে ঐ প্রতিবন্ধকতাগুলি কাটিয়ে ওঠা যায় ও উদ্দেশ্যসমূহ সফল করে তোলা যায়। এলাকার এবং বিশেষ করে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য/পরিবেশ সম্পর্কিত কোন সমস্যাগুলি বিশেষভাবে প্রকট এবং সংকলিত উদ্দেশ্যসমূহে সেগুলির প্রতিফলন আছে কি না। সমন্বিত আলোচনার ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ করুন।

এখানে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ

ক) বিদ্যালয় স্বাস্থ্যপ্রকল্প কোনও বিচ্ছিন্ন কর্মসূচি নয়, সমাজের সর্বস্তরে স্বাস্থ্যসচেতনতা গড়ে তোলবার যে ব্যাপক জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণীয়, তারই অংশমাত্র।

খ) এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (target) যদিও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা, কিন্তু প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত শিক্ষিকা-শিক্ষক, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং সমাজের অন্যান্য অংশের বহু মানুষই প্রকল্পের পরিকল্পিত রূপায়ণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন হবার সুযোগ লাভ করবেন।

গ) প্রকল্পটির সুষ্ঠু রূপায়ণ সম্ভব হলে সমাজ ও বিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড়তর হবে, বিদ্যালয়ের প্রতি সমাজের আগ্রহ ও নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে, অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অধিকতর আগ্রহী হবেন। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো এসবের উন্নয়নের নিশ্চিত সম্ভবনা। অর্থাৎ, এই প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণ সম্ভব হলে এটি ব্যাপকতর উদ্দেশ্যসাধক হতে পারে।

ঘ) একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে আলোচ্য প্রকল্পটিকে তিনটি উপাদানের সমষ্টি হিসেবে ভাবা যেতে পারে ঃ (১) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা গঠন, (২) স্বাস্থ্যশিক্ষা (স্বাস্থ্যবিধি পালনসহ), (৩) স্বাস্থ্যপরীক্ষা ব্যবস্থা – বিদ্যালয়েই নিয়মিতভাবে এবং সম্ভব হলে চিকিৎসকের উপস্থিতিতে। মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য শিবির সংগঠনের মাধ্যমে বিশেষ স্বাস্থ্যপরীক্ষা ব্যবস্থা। এই বিশেষ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য দফতরের সক্রিয় সহযোগিতাতেই সম্ভবপর।

কর্মতালিকা – ২

স্বাস্থ্য বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং বিদ্যালয় স্বাস্থ্য প্রকল্পে স্বাস্থ্যশিক্ষার কোন দিকগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার, নিয়মিত ও বিশেষ স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা কীভাবে সুষ্ঠুভাবে করা যায়, এসব বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা করুন। আলোচনার ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ করুন।

স্বাস্থ্য ঃ

সাধারণভাবে একটি কথা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে ঃ "A sound mind in a sound body", অর্থাৎ "সুস্থ শরীরে সুস্থ মন"। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত স্বাস্থ্যের সংজ্ঞাটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এই সংজ্ঞানুসারে "স্বাস্থ্য হল শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক দিক থেকে পূর্ণ সুস্থতার অবস্থা, নিছক রোগব্যাধি বা প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত থাকাই স্বাস্থ্য নয়"। সাম্প্রতিককালে এই সংজ্ঞাটিকে পরিবর্ধিত করে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে সুস্থতার অবস্থাকেও স্বাস্থ্যের লক্ষণ হিসেবে সংযোজিত করা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষাকরণ ব্যবস্থা

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং রুটিনমাফিক (যেমন মাসে একটি দিন) প্রাথমিকভাবে কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু বিষয় দেখতে পারেন। একটি রেকর্ড কার্ডে বিষয়ের উল্লেখ করে করণীয় পরামর্শ লিখিত আকারে রাখা যেতে পারে।

শারীরিক অঙ্গ	যা দেখবেন বা জানবেন	মন্তব্য
১। **চোখ**	লাল হয় কিনা, পিচুটি জমে কিনা, আলো সহ্য হয় কিনা, বোর্ডের লেখা পড়তে অসুবিধা হয় কিনা, খুব ট্যারা কিনা, চোখ প্রায়শই জ্বালা করে চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে কিনা বা চোখের পাতা মুড়ে যায় কিনা	প্রাথমিকভাবে এরূপ পর্যবেক্ষণের পর প্রয়োজনে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্যে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে হবে (পরীক্ষা পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে পরে প্রদত্ত হল)।
২। **কান**	শিক্ষকের নির্দেশ শুনতে/বুঝতে পারে না, শ্রেণীকক্ষে অমনোযোগী, কানে যন্ত্রনা হয়, কান থেকে রস পড়ে, কানের মধ্যে গুনগুনানি আওয়াজ – এসব হয় কিনা।	**জটিল ক্ষেত্রে চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা কাম্য।**
৩। **নাক**	প্রায়শ বা দীর্ঘদিনস্থায়ী সর্দি, কাশি, নাক দিয়ে অনবরত সর্দি ঝরা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, নাকের পরিবর্তে মুখ দিয়ে প্রায়শ শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, এসব হয় কিনা।	
৪। **গলা**	ঘাড়ে বা গলায় গ্ল্যান্ড ফোলা, গিলতে কষ্ট হওয়া, গলা জ্বালা করা, স্বরভঙ্গ, এসবের সমস্যা আছে কিনা।	
৫। **মুখ ও দাঁত**	মুখে ঘা, মুখের দু'পাশে ঠোঁট ফাটে, মাড়ি ফোলে এবং প্রায়শ রক্ত পড়ে। দাঁতের মধ্যে গর্ত, দাঁতে ছোপ ধরা, দাঁতে ছাতা পড়ে, মুখে দুর্গন্ধ, এসব দেখা/বোঝা যায় কিনা, জিভে ফুসকুড়ি হয় কিনা।	
৬। **চুল ও মাথা**	চুলে উকুন বা উকুনের ডিম বা খুসকি দৃশ্যমান কিনা, চুল উঠে যায় কিনা, চুলের রঙ বদলেছে কিনা, চুল নোংরা-অবিন্যস্ত কিনা, মাথায় চাঁদিতে ঘা, লাল দাগ এসব আছে কিনা।	
৭। **ত্বক**	শুকনো বা খসখসে, লাল ত্বক, প্রায়ই ঘা ও ফোড়া হয়, আঁচিল দেখা যায় কিনা, দাদ ও চামড়ার বিভিন্ন রোগ, খোস-পাঁচড়া – এসব হয় কিনা।	
৮। **মেরুদন্ড ও অন্যান্য**	বাঁকা মেরুদন্ড, খাঁজ পড়া বুক, ফোলা গাঁট, কৃশকন্ধ, অসঙ্গতিপূর্ণ চলনভঙ্গি, শিহরণ অসাড়ে প্রস্রাব করা, পেটে বেদনা, বারবার পায়খানা যাওয়া, এসব হয় কিনা।	
৯। **সাধারণ গঠন ও আচার আচরণ**	প্রায়শই জ্বর হওয়া, ওজন না বাড়া, খুব কম বা খুব বেশি ওজন, (নিয়মিত ওজন পরীক্ষা করুন, বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী ওজন ঠিক আছে কিনা চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন), ফ্যাকাশে বা বিবর্ণ দেখতে, বিকারগ্রস্তের মতো দেহভঙ্গি, কুঁড়েমির শিকার, অমনোযোগী, অল্প শ্রমেই ক্লান্ত এবং প্রশ্বাস নিতে কষ্ট।	উল্লেখিত চার্টটি পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হয়েছে

এই ধরনের নিয়মিত ও দরদি পর্যবেক্ষণ থেকে শিক্ষিকা-শিক্ষক বুঝতে পারবেন কোন ছাত্র বা ছাত্রী অসুস্থ এবং অসুস্থতা কোন ধরনের। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষিকা-শিক্ষকের করণীয় হবে দ্বিবিধ, অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবককে এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত করা এবং সহায়ক চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হওয়া। বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তির কোনও ত্রুটি আছে কিনা তা দেখবার জন্য চিকিৎসকের সাহায্যে বছরে অন্তত একবার বিদ্যালয়ে বা প্রতিবেশী বিদ্যালয়গুচ্ছে একত্রে চোখ ও কান পরীক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। বিদ্যালয়ে হেল্থ কার্ড পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।

কর্মতালিকা – ৩

আপনাদের বিদ্যালয়ে বা এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত কোন কোন সমস্যা সব চাইতে প্রকট বলে মনে হয় এবং সেগুলির সমাধানে বিদ্যালয়েই কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্থির করুন। যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা এখানে বলা হয়েছে আপনাদের বিদ্যালয়ের পরিবেশে সেটি কার্যকর করা সম্ভব বলে আপনারা মনে করেন কি? কী কী অসুবিধা এ বিষয়ে দেখা দিতে পারে বলে আপনারা মনে করেন? এই অসুবিধাগুলি দূরীকরণে কী কী করণীয় বলে আপনারা মনে করেন? গ্রুপভিত্তিক আলোচনা করুন এবং আলোচনার ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ করুন।

১ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ভারতীয় ছেলে এবং মেয়েদের উচ্চতা ও ওজন ঃ

বয়স বছর	উচ্চতা ছেলে (সেঃ মিঃ)	উচ্চতা মেয়ে (সেঃ মিঃ)	ওজন ছেলে (কিঃ গ্রাঃ)	ওজন মেয়ে (কিঃ গ্রাঃ)
১	৭২.৫	৭২.৫	৮.৫	৭.৫
২	৮৭.৫	৮৬.৬	১২.৬	১২.৩
৩	৯৬.২	৯৫.৭	১৪.৬	১৪.৪
৪	১০৩.৪	১০৩.২	১৬.৫	১৬.৪
৫	১০৮.৭	১০৯.১	১৮.৪	১৮.৪
৬	১১৮.৯	১১৭.৩	২২.১	২১.৪
৭	১২৩.৩	১২২.৭	২৪.৫	২৪.১
৮		১২৬.৮	২৬.৪	২৬.১
৯	১৩৩.৬	১৩২.৩	৩০.০	২৯.৭
১০	১৩৮.৫	১৩৮.৫	৩২.৪	৩৫.৫
১১	১৪৩.৪	১৪৪.১	৩৫.৩	৩৬.৫
১২	১৪৮.৯	১৫০.৩	৩৮.৮	৪২.৬
১৩	১৫৩.০	১৫৩.০	৪২.৯	৪৪.৪
১৪	১৬১.৭	১৫৫.১	৪৮.৩	৪৭.৭
১৫	১৬৫.৩	১৫৫.৩	৫২.২	৪৮.২
১৬	১৬৮.০	১৫৫.৯	৫৫.৫	৪৯.৮
১৭	১৬৮.৯	১৫৬.৪	৫৯.০	৪৯.৯
১৮	১৬৯.৯	১৫৬.৮	৬১.১	৫০.১

আই.সি.এম.আর. (১৯৭২) গ্রোথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অব ইন্ডিয়ার ইনফ্যান্টস অ্যান্ড চিল্ড্রেন টেক সিরিয়াল নম্বর – ১৮।

দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা এবং ফার্স্ট-এইড শিক্ষা

বিভিন্ন কারণে শিশুদের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এই সব দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে ছাত্রছাত্রীদের আগে থেকে সাবধান করে দিতে পারলে হয়তো অনেকটা সুফল মিলতে পারে। এলাকা ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুযায়ী দুর্ঘটনার প্রকৃতি বা সম্ভাব্য কারণগুলি কিছুটা ভিন্নতর হতে পারে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলবার কার্যকরী পরামর্শ দিতে হবে। যেমন, শহরাঞ্চলে পথ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেশি কাজেই শহরাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের সতর্কে পথ চলা, রাস্তা পারাপার করা, বাসে-ট্রামে ওঠা-নামায় সতর্কতা অবলম্বন এসব বিষয়ে বিশেষ ভাবে বলা দরকার। আবার গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জলে ডোবা, সাপে কাটা এসব দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি, কাজেই এসব দুর্ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ছাত্রছাত্রীদের সতর্কতা অবলম্বন করার শিক্ষা দিতে হবে। সাঁতার না জেনে পুকুর বা নদীতে স্নান করতে নামা যে উচিত নয়, আলো ছাড়া অন্ধকারে পথ চলা যে বিপজ্জনক এবং যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা দরকার, এসব কথা ছাত্রছাত্রীদের মনে গেঁথে দেওয়া দরকার। পিকনিক করতে গিয়ে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নদী-সমুদ্রে নেমে স্নান করতে যাওয়া যে অত্যন্ত বিপজ্জনক অভিজ্ঞতালব্ধ বা শোনা দু একটি ঘটনা গল্পের মত শুনিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে। সাধারণভাবে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করা, খেলাধুলা করতে গিয়ে হাত-পা না ভাঙে সেদিকে সতর্ক থাকা, হঠকারিতামূলক বা দুঃসাহসিক বেপরোয়া কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা, এসব বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক করা দরকার। ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিদ্যালয়ে/বাড়িতে দরজা-জানলা খোলা-বন্ধ করার সময়ে সতর্ক থাকে, দেহের কোথাও আঘাত না পায়, মাটিতে (ঘরের মেঝেতেই হোক বা মাঠে, পথে) কোনও রূপ গর্তের মধ্যে তারা যাতে হাত না ঢোকায়, ভিজে হাতে বৈদ্যুতিক সুইচে হাত না দেয়, বিদ্যুৎবাহী তারে জামা-কাপড় মেলে না দেয়, আগুন থেকে সতর্ক থাকে (আগুনে পুড়ে যাওয়া বা অসতর্কতামূলক কাজের মাধ্যমে কোনও কিছুতে আগুন লাগিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো এসব সম্পর্কে), এমনতর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে অবহিত করতে হবে। প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টির সময় বাড়ির বাইরে বা খোলা মাঠে থাকা উচিত নয় এবং এমন অবস্থায় বাড়িতে টি.ভি., রেডিও এসব না চালানো উচিত – এসব বিষয় সম্পর্কেও তাদের বলা দরকার। খুব বেশি টিভি দেখা চোখের ও মনের পক্ষে খারাপ।

ফার্স্ট-এইড

হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে অন্তত প্রাথমিক ভাবে কী করণীয় অর্থাৎ ফার্স্ট-এইড সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। হাত-পায়ের কোথাও হঠাৎ কেটে ছড়ে গেলে বা হাত-পা মচকে গেলে প্রাথমিক ভাবে কী করণীয়, জলে ডোবা বা আগুনে পোড়া ব্যক্তিকে কীভাবে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা করতে হবে, সাপে কাটলে কী করণীয়, বৈদ্যুতিক শক খেলে (তড়িদাহত হলে) প্রাথমিকভাবে কী করণীয় এসব কিছু সম্পর্কেই ছাত্রছাত্রীদের শেখা/শেখানো দরকার। এসব কিছুর ক্ষেত্রেই অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে রোগীকে যথাসত্বর নিয়ে যেতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে কিছু সময় লেগে যেতে পারে, তাই রোগীর অবস্থার যাতে অবনতি না হয় এবং তার জীবন রক্ষা পায় সেজন্য প্রাথমিক কিছু ব্যবস্থা নিতেই হবে। যেমন, হাত-পা কেটে রক্ত বেরোলে প্রথমেই কাটা জায়গায় হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে জোরে কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখতে হবে, সামান্য কাটার ক্ষেত্রে গাঁদা ফুলের পাতা পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিয়ে হাতে থেঁতো করে নিয়ে কাটা জায়গায় লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়, রক্ত পড়া খুব বেশি হলে কাটা জায়গায় ভালো করে প্যাড দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। রক্ত বন্ধ হলে কোনও হাতের কাছে লভ্য অ্যান্টিসেপটিক (মলম) লাগানো দরকার এবং সাথে সাথে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। হাতে পায়ে চোট আঘাতে চুন-হলুদ গরম করে লাগানো দীর্ঘদিনের অনুসৃত একটি প্রক্রিয়া। সাধারণ চোট আঘাতে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। জলে ডোবা ব্যক্তিকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে মুখটা একপাশে রেখে তলপেটের দু'দিকে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে তার মুখ দিয়ে জল বার করে দেবার চেষ্টা করতে হবে। বুকের বাঁদিকে হাত দিয়ে ম্যাসাজ করে এবং তার মুখ খুলে ফুঁ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করতে হবে এবং যথাসত্বর সম্ভব চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আগুনে পোড়া ব্যক্তির পোড়া অংশ (সামান্য পুড়লেই কেবল) পরিষ্কার জল দিয়ে পরিষ্কার করে ভালোভাবে কোনো অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে দিতে হবে। গায়ে আগুন লাগলে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গড়াগড়ি খাওয়াতে হবে, কম্বল বা এই ধরনের ভারী কিছু দিয়ে সারা শরীর চাপা দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে হবে। তারপর সারা দেহে জল ঢেলে পরিষ্কার করে পোড়া স্থান পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজের মত জড়িয়ে নিয়ে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সাপে কাটা রোগীকে মানসিকভাবে সাহস যোগাতে হবে এবং হাসপাতালে নিতে হবে। বাঁধন দিয়ে যদিও

কোনও লাভ হয় না তবে রোগীকে মানসিক ভরসা যোগাতে বাঁধন দেওয়া যেতে পারে, তবে লক্ষ রাখতে হবে বাঁধন যেন শক্ত না হয়। কেউ তড়িদাহত হলে প্রথমেই সুইচ অফ করতে হবে বা শুকনো কাঠের দন্ড দিয়ে তার ইত্যাদি থেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। তড়িদাহত ব্যক্তিকে সাথে সাথে গরম দুধ বা নুন জল পান করিয়ে দেওয়া উচিত। এই ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি বা ফার্স্ট এইড ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে হবে। এসব বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় শিক্ষিকা-শিক্ষকগণ প্রশিক্ষিত হবেন এবং তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষিত করবেন। অভিনয়ের মাধ্যমে নকল মহড়ার অবস্থা সৃষ্টি করে এই ধরনের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে সেটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় হবে এবং সেই শিক্ষা অধিকতর কার্যকরী হবে।

কর্ম তালিকা - ৪

আপনাদের এলাকায়/বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের কী ধরনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বর্তমান এবং ঐসব এড়িয়ে চলতে কী ধরনের পরামর্শ আপনাদের ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া প্রয়োজন বলে আপনারা মনে করেন। কোন কোন স্থানগুলি দুর্ঘটনাপ্রবণ বলে আপনাদের মনে হয়? ফার্স্ট এইড সম্পর্কিত শিক্ষার আকর্ষণীয় পদ্ধতি কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে দু-একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির উদাহরণ দিন এবং পদ্ধতি কেমনভাবে প্রয়োগ করবেন প্রয়োগ মাধ্যমের বিষয়বস্তু (নাটক ইত্যাদি) উদ্ভাবনের মাধ্যমে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিন। বিদ্যালয়ে একটি ফার্স্ট-এইড বক্স থাকা অত্যাবশ্যক বলে আপনারা মনে করেন কি না, ফার্স্ট-এইড সম্পর্কে ভালোভাবে জানবার জন্য পারিপার্শ্বিক সমাজের কোন্ সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন এবং কীভাবে এই সাহায্য লভ্য হতে পারে, এসব সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা করুন। আলোচনার ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ করুন।

ফার্স্ট এইড বাক্সে ন্যূনতম যে জিনিসগুলি রাখা প্রয়োজন

ব্যান্ডেজ (বা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো), গজ, তুলো, ব্যান্ডএইড, কোনো অ্যান্টিসেপটিক মলম – যেমন, ডেটলের টিউব, বোরোলিন, নিওস্পোরিন ইত্যাদি, স্যাভলন বা ডেটল (তরল), বার্নলের টিউব, অম্রুতাঞ্জন বা আয়োডেক্স, লিউকোপ্লাস্টার, সম্ভব হলে ক্রেপ ব্যান্ডেজ, ছোটো কাঁচি, নোট বুক ও পেনসিল ইত্যাদি (বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিন)।

শিশুদের কয়েকটি সাধারণ রোগ এবং প্রাথমিকভাবে এসব সম্পর্কে করণীয় সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ

রক্তাল্পতা

সমস্যা

রক্তের লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিন কম থাকার দরুন রক্তল্পতা হয়। দেহের সমস্ত অঙ্গো ও পেশিতে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়ার জন্য হিমোগ্লোবিনের প্রয়োজন হয়। রক্তাল্পতার ফলে শরীরের প্রধান অঙ্গাগুলিতে অক্সিজেনের অভাব হয়ে পড়ে যা শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। রক্তাল্পতায় আক্রান্ত শিশু সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা হাঁপিয়ে ওঠে। এই ধরনের শিশুরা বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ে। রক্তাল্পতা মারাত্মক আকার ধারণ করলে সংক্রমণ অথবা হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার দরুন মৃত্যুও হতে পারে। রক্তাল্পতার প্রধান প্রধান কারণগুলি হল ঃ

- **খাদ্যে লৌহজাত উপাদানের স্বল্পতা ঃ**

এমন পথ্য যাতে লৌহপ্রধান খাদ্য যেমন, সবুজ পাতাওয়ালা শাক-সবজি, ডাল, চিনা বাদাম, গুড়, ছোলা সেদ্ধ ও তালমিছরি নেই।

- **কৃমি সংক্রমণ যেমন ঃ**

  বক্রকৃমি. বা হুকওয়ার্ম
  গোলকৃমি
  ফিতাকৃমি

- **কঠিন রোগ যেমন ঃ**

  ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয় (মলে রক্তের উপস্থিতি) প্রভৃতি

চিহ্ন ও পূর্বলক্ষণ

নখ, জিভ ও নীচের ঠোঁট এবং চোখের পাতার কোল ফ্যাকাশে হওয়ার লক্ষণ দেখা দিলে রক্তাল্পতা হয়েছে ধরতে হবে।

রোগ তীব্র আকার ধারণ করলে শিশু সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এমনকি অতি অল্প পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট ও হাত, পা, শরীর ফোলার অভিযোগ করে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে খড়ি ও মাটি খাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

বিদ্যালয় পর্যায়ে পরীক্ষা পর্ব

উদ্দেশ্য

রক্তাল্পতার জন্য সমস্ত শিশুকে পরীক্ষা করতে হবে। এর ফলে যেসব শিশুর মধ্যে রোগের লক্ষণগুলি প্রকট তাদের চিকিৎসা ও পথ্য বিষয়ে পরামর্শদান এবং যাদের মধ্যে প্রায়ই কৃমির উপদ্রব ও অন্যান্য পূর্বলক্ষণ দেখা দেয় তাদের চিকিৎসার জন্য পাঠানোর ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।

স্থান

আলোয় খোলামেলা জায়গায় শিশুদের রক্তাল্পতা পরীক্ষা করা উচিত। সাধারণত দিনের আলোয় উন্মুক্ত জায়গায় শিশুদের এই পরীক্ষা করা উত্তম হবে।

পদক্ষেপ -- রোগ চেনার উপায়

১। রক্তাল্পতার প্রকট চিহ্নগুলি দেখুন।

- **নখ পরীক্ষা করুন ঃ** শিশুকে নখগুলি উপরের দিকে তুলে ধরে হাত মেলে ধরতে বলুন ও নখগুলির দিকে লক্ষ করুন
- যদি নখগুলি ফ্যাকাশে দেখা যায় তাহলে তা রক্তাল্পতার চিহ্ন হিসাবে ধরতে হবে।
- আপনার হাতের তালুর সাথে শিশুর হাতের তালু মিলিয়ে দেখুন। যদি আপনার হাতের তালুর থেকে শিশর হাতের তালু বেশি ফ্যাকাশে দেখা যায় তবে শিশুর রক্তাল্পতা হয়েছে ধরতে হবে। (আপনার নিজের রক্তাল্পতা থাকলে স্বাস্থ্যবান অন্য একটি শিশুর হাতের তালুর সঙ্গো আলোচ্য শিশুটির হাতের তালু মিলিয়ে দেখুন)
- চোখের কোল পরীক্ষা করুন। রক্তল্পতা থাকলে ফ্যাকাসে দেখাবে।
- **জিভ পরীক্ষা করুন ঃ** যদি জিভ ফ্যাকাশে দেখায় তবে ধরতে হবে শিশু রক্তাল্পতায় ভুগছে।
- পায়ের গোড়ালির কাছে টিপে দেখুন। ফোলা থাকলে রক্তাল্পতা সন্দেহ করা যায়।

২। যে সব শিশুর মধ্যে রক্তাল্পতার চিহ্ন প্রকট রয়েছে বলে আপনি সন্দেহ করছেন তাদের নীচের প্রশ্নগুলি করুন ঃ

শিশু কি সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে ? অল্প পরিশ্রমেই কি শ্বাসকষ্ট হয়? হাত, পা ও শরীরে ফোলা, জ্বর ও আমাশয় হয় কিনা।

শিশু সব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে অভিভাবক/অভিভাবিকার সঙ্গো যোগাযোগ করে সব জানতে হবে।

চিকিৎসা

- যে সব শিশুর মধ্যে রক্তাল্পতার চিহ্ন প্রকট বলে আপনি মনে করেন তাদের লৌহ ও ফলিক এ্যাসিড যুক্ত (ছোটো) ট্যাবলেট দিন (চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিন)।

মাত্রা ঃ দুপুরে খাওয়ার পর দিনে ২টি করে ট্যাবলেট ১২ সপ্তাহ দেওয়া বিধেয় (চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী)।

- যে সব শিশুর মধ্যে রক্তাল্পতার চিহ্ন প্রকট তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য অবিলম্বে প্রাথমিক / সমষ্টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (Community Health Centre) পাঠানো উচিত। সম্ভব হলে বছরে একবার শিশুর প্রস্রাব, পায়খানা ও রক্ত এবং রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা দরকার।

শিক্ষক/শিক্ষিকার কর্তব্য

সমস্ত ক্ষেত্রেই শিশুদের রক্তাল্পতা দেখা দিলে তাদের পিতামাতাকে ডেকে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরামর্শ দিতে হবে, যেমন ঃ

রোগ প্রতিরোধ

রক্তাল্পতা তীব্র আকার ধারণ করার অন্যতম প্রধান কারণ হল বক্রকৃমির উপদ্রব। বিষ্ঠায় প্রদূষিত মাটিতে বক্র কৃমি জন্মায়। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্করা খালি পায়ে হাঁটলে পায়ের ত্বকের মধ্য দিয়ে তা শরীরে প্রবেশ করে। খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করলে মলের সাথে বক্র কৃমির ডিম বেরিয়ে আসে এবং মাটি দূষিত করে শিশুদের খালি পায়ে হাঁটতে ও খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করা নিষেধ – এই সাধারণ উপদেশের মাধ্যমেই এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

রাতকানা

ভিটামিন 'এ' অভাব জনিত রোগ

সমস্যা

দৃষ্টিশক্তির (চক্ষু) জন্য ভিটামিন 'এ' –র প্রয়োজন। এটি শারীরিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং শিশুকে নানা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ভিটামিন 'এ' ঘাটতির অন্যতম লক্ষণ হল রাতকানা রোগ। ঠিকমতো চিকিৎসা না করা হলে ভিটামিন 'এ' ঘাটতির ফলে স্থায়ী অন্ধত্ব ঘটতে পারে।

প্রধান লক্ষণ ও পূর্ব লক্ষণ

শিশু রাত্রে অথবা অল্প আলোয় দেখতে না পাওয়ার অভিযোগ করবে। এই পূর্ব লক্ষণ সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে সুপরিচিত এবং স্থানীয়ভাবে এই অবস্থার অনেক নাম রয়েছে।

চিকিৎসা

এর চিকিৎসায় আছে ভিটামিন 'এ' মিশ্রণ প্রদান। এক মাত্রা (২ মি.লি.) ভিটামিন 'এ' মিশ্রণ (২,০০,০০০) (আই. ইউ.) দিন।

এক মাস পর এই মাত্রার পুনরাবৃত্তি করুন।

কোথায় চিকিৎসা পাওয়া যেতে পারে ঃ ভিটামিন 'এ' উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া যায়।

রেফারাল (প্রেরণ)

- রাতকানায় আক্রান্ত শিশুদের দৈহিক পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের কাছে পাঠানো উচিত।

অন্যান্য পদক্ষেপ

খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'এ' না থাকলে তবেই ভিটামিন 'এ' ঘাটতি হয়। সবুজ পাতাওয়ালা শাক, সবজি ও গাঢ় হলুদ ফলে ভিটামিন 'এ' থাকে। শিশুদের খাবারে এগুলি থাকা উচিত।

শিক্ষকদের কর্তব্য

শিক্ষিকা-শিক্ষকরা অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ও বিদ্যালয়ের শিশুদের সবুজ পাতাওয়ালা শাক-সবজি ও গাঢ় হলুদ ফল যুক্ত সুষম খাদ্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন।

- যদি কোনো শ্রেণীর কোনো শিশু রাতকানা রোগের অভিযোগ করে তাকে অবিলম্বে উপকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত।
- যদি শিশুদের বাড়িতে ছোটো ভাই-বোন থাকে তবে বছরে দু'বার তাদের ভিটামিন 'এ'র রোগ নিবারক ওষুধের মাত্রা সেবন করানোর জন্য পিতামাতাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত।

ভিটামিন 'এ' অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করলে তার দরুণ গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে ভিটামিন 'এ' দেওয়া উচিত।

আয়োডিন অভাব জনিত রোগ

সমস্যা

শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও শারীরিক উন্নতির জন্য আয়োডিন এক অত্যাবশ্যক অনু-পৌষ্টিক পদার্থ। দেহের ও মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় থাইরোসিন রস প্রস্তুতের কাজে শরীরে এর প্রয়োজন হয়। এই রসের অভাবে শারীরিক বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দৈহিক বিকাশ হ্রাস পায় ও শিশুর মানসিক কার্যকলাপ পর্যন্ত ব্যাহত হয়।

প্রধান লক্ষণ ও পূর্ব লক্ষণ

- আয়োডিন ঘাটতির সব থেকে সাধারণ প্রকাশ হল গলগন্ড। গলগন্ড হল গলায় একরকম স্ফীতি বা মাংসপিন্ডের আবির্ভাব। আয়োডিন ঘাটতির ক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে এই উপসর্গ দেখা দেয়।

আয়োডিন ঘাটতি তীব্র আকার ধারণ করলে শিশুদের মধ্যে যেসব লক্ষণ দেখা দেয় সেগুলি হল ঃ

- দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি হ্রাস।
- দুর্বল মানসিক কার্যকলাপ যার ফলে বিদ্যালয়ে শিশু নিম্নবুদ্ধিবৃত্তি বা স্বাভাবিক মানের থেকে কম বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

বিদ্যালয় পর্যায়ে পরীক্ষা ঃ

যে সব শিশু কম বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন (আই.কিউ.) পড়াশুনায় সাধারণ শিশুর থেকে খারাপ ফল করছে ও যাদের গলায় ফোলা ভাব দেখা যায় তাদের আয়োডিনের ঘাটতি রয়েছে বলে ধরা হবে।

চিকিৎসা

আগের থেকে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও পরামর্শদানের ফলে এই ধরনের শিশুর রোগ প্রশমণে সুবিধা হয়। সমস্ত শিশু যাদের আয়োডিন ঘাটতি রয়েছে বলে ধরা হচ্ছে তাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের কাছে পাঠানো উচিত।

রোগ প্রতিরোধ

খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবণ নিয়মিত ব্যবহারের দ্বারা আয়োডিন ঘাটতিজনিত অসুবিধা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

শিক্ষকদের কর্তব্য

- আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের সুবিধা সম্বন্ধে শিক্ষকরা শিশু ও সমাজকে অবহিত করতে পারেন। এই লবণ সমস্ত মুদিখানায় সাধারণত পাওয়া যায়।
- যে সব শিশু সাধারণের থেকে কম বুদ্ধি বৃত্তি অবথা বিদ্যালয় পর্যায়ে পরীক্ষায় সাধারণের থেকে মান কম পঠনপাঠনে খারাপ ফল অথবা গলগন্ডে ভুগছে তাদের আয়োডিনের অভাব রয়েছে বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। ঐসব শিশুর পিতামাতাকে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার ও ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে বলতে হবে।

খোস ও পাঁচড়া

সমস্যা

এটি একটি সাধারণ চর্মরোগ যা ছোটো শিশুদের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায়। এক ধরনের মাকড় থেকে এই রোগ জন্মায়। এই রোগ ভীষণ সংক্রামক এবং রোগীর সংস্পর্শে এলে ও একই বিছানায় এক সঙ্গে থাকলে এই রোগ একজনের থেকে আরেকজনের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে।

প্রধান লক্ষণ ও পূর্ব লক্ষণ

এই মাকড় নিজে থেকে ত্বকের মাঝে খুঁড়ে (সুড়ঙ্গ করে) বাস করে এবং তার ফলে --

- আক্রান্ত জায়গা লালচে দেখায়। অনেক ফুসকুড়ি বের হয়।
- ভীষণ চুলকানি হয়, বিশেষ করে রাত্রে এই চুলকানি তীব্র হয় ও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।
- ক্ষত সংক্রামিত হয় এবং তা থেকে রস বা পুঁজ গড়ায় তখন তাকে পাঁচড়া বলে।
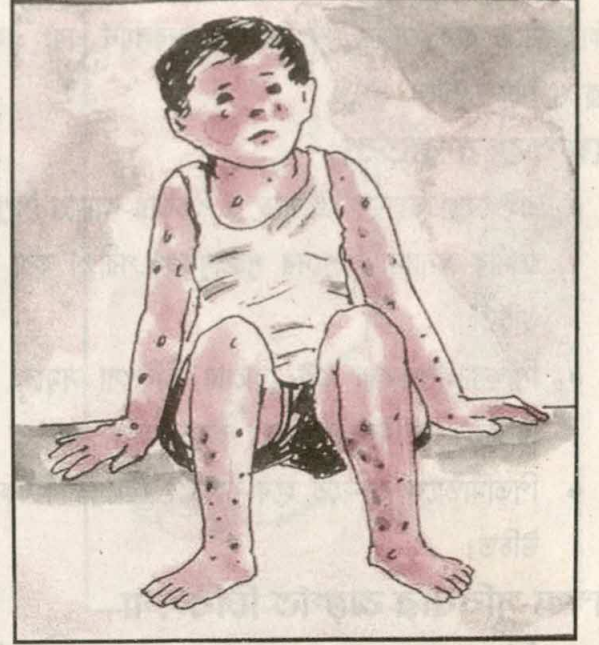
বিদ্যালয় পর্যায়ে পরীক্ষা

বিশেষ করে রাত্রে চুলকানি হয় কিনা তা প্রতিটি শিশুকে জিজ্ঞাসা করুন।

যে সব শিশু এইসব উপসর্গের অভিযোগ করে, আলোক উজ্জ্বল জায়গায় তাদের ত্বক ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে। লক্ষ রাখুন --

● আঙুলের ফাঁকে ● কবজির চারপাশে ● দুই বগল ● নাভির চারপাশে ● তলপেট ● কুঁচকি / জননেন্দ্রিয় ● নিতম্ব।

পাঁচড়ায় আক্রান্ত শিশুর মধ্যে এসব উপসর্গ লক্ষ করা যায় যেমন

- ত্বকে ফুসকুড়ি এবং স্মাত।
- ক্ষতের চারপাশে লালচে ভাব।
- আঙুলের ফাঁকে প্রথম ক্ষত দেখা দেয় এবং এর থেকে বোঝা যায় যে পাঁচড়া হচ্ছে।

চিকিৎসা

- লিডডেন বা গামাবেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড ও আরও কয়েকটি অন্য ওষুধ লাগালে পাঁচড়া সম্পূর্ণ সেরে যায়।

- দৈহিক পরীক্ষা ও চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য খোস পাঁচড়ায় আক্রান্ত শিশুকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো উচিত। পরিবারের সকলেরই চিকিৎসার প্রয়োজন এবং শিশুর পিতামাতার সঙ্গো শিক্ষকরা কথা বললে তা কার্যকর হবে।

অন্যান্য ব্যবস্থা

বিছানার চাদর, তোয়ালে ও অন্তর্বাসসহ অন্যান্য জামা কাপড় চিকিৎসাকালে ব্যবহারের পূর্বে গরম জলে কেচে বা রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। যদি এসব সতর্কতা অবলম্বন এবং একই সঙ্গো পরিবারের সকলের চিকিৎসা না করা হয় তবে পুনরায় সংক্রমণ ঘটতে পারে।

শিক্ষকদের কর্তব্য

- এই রোগ ভয়ানক ছোঁয়াচে ও পাঁচড়ায়-আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শে এলে অন্যান্য শিশুদের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হয়। শ্রেণীর অন্যান্য শিশুদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা উচিত এবং তাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া উচিত।
- শিক্ষিকা-শিক্ষকরা এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ও ছাত্রদের পরামর্শ দিতে পারেন। লিডডেন মৌখিকভাবে গ্রহণ করা বিষাক্ত এবং তা ছোটো শিশুদের হাতের নাগালের বাইরে রাখা উচিত।
- পিতামাতাকে জানাতে হবে যে এই রোগের কার্যকর চিকিৎসার জন্য পরিবারের সকলের একই সঙ্গো চিকিৎসা করা উচিত।

স্বাস্থ্য সুবিধার অন্তর্গত চিকিৎসা

১। লিডডেন মলম বা লোশন লাগান (শিশু ১২.৫%, প্রাপ্তবয়স্ক ২৫%)

- শিশুর গলার নিম্নাংশের দেহে তরল মিশ্রণ মাখাতে হবে, রোজ একবার চানের পর লাগাতে হবে। মোট ৬দিন লিনডেন ২% লাগাতে হবে।
- শিশুর ব্যবহৃত অন্তর্বাসসহ সমস্ত বিছানার চাদর ও তোয়ালে গরম জলে কেচে রোদে শুকাতে হবে।
- একইভাবে পরিবারের সকলের চিকিৎসা করতে হবে।

২। অন্যান্য ওষুধ

এই সব ওষুধের একটি সুবিধা হল যে এগুলি বেঞ্জিল বেঞ্জোয়েটের তুলনায় কমবার লাগাতে হয় কিন্তু ব্যয় সাপেক্ষ।

- ১২.৫% বেঞ্জিন বেঞ্জয়েট তেমন কার্যকর নয়।
  ৫% পারমেথ্রিন ক্রিম - একবার লাগাতে হয়।

একজন কন্যাশিশুর পরীক্ষা একজন শিক্ষিকা বা মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে দিয়ে করানো উচিত।

পায়োডার্মা (ফোড়া / পুঁজবিশিষ্ট ক্ষত)

পায়োডার্মা এক ধরনের সাধারণ ত্বকের রোগ যা ছোটো শিশুদের মধ্যে দেখা যায় এবং এর বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি ক্ষত যার থেকে রস বা পুঁজ গড়ায়। রোগটি সংক্রামক এবং সংস্পর্শের মাধ্যমে একজনের থেকে আর একজনের মধ্যে প্রবেশ করে। চিকিৎসা না করা হলে এই সংক্রমণ শরীরের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

প্রধান লক্ষণ ও পূর্ব লক্ষণ

পায়োডার্মায় আক্রান্ত শিশু দেহের ত্বকের ক্ষতের সঙ্গে আরও যেসব উপসর্গ দেখা যায় সেগুলি হল ঃ

- ফোলা • রক্তিমতা • পুঁজ অথবা রস গড়ানো
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যথা, জ্বর ও চুলকানি থাকতে পারে।

বিদ্যালয় পর্যায়ে পরীক্ষা

যদি কোনো শিশুর উপরে উল্লিখিত কোনো উপসর্গ দেখা যায় তবে তার পায়োডার্মা হয়েছে বলে ধরা হবে।
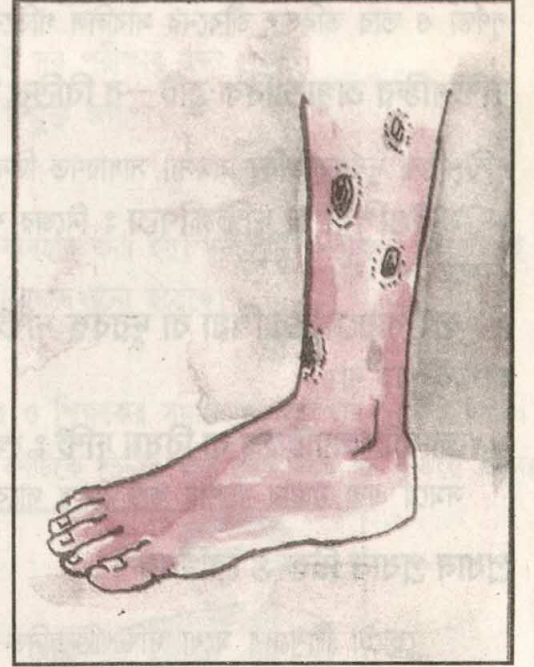
চিকিৎসা

পায়োডার্মা সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য। বিদ্যালয় স্তরে শিশুর ক্ষেত্রে যেখানে ক্ষত থেকে রস অথবা পুঁজ গড়ায় সেখানে ২% জেন্সিয়ান ভায়োলেট পেন্ট লাগাতে হবে। দরকার হলে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে হবে। কোন সময় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হতে পারে।
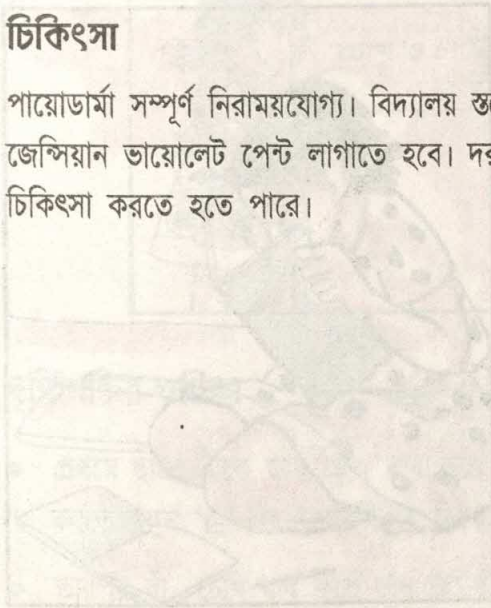
শিশুদের চোখে দেখার সমস্যা

সমস্যা

আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখ-ই সবচেয়ে মূল্যবান। একটি শিশুর শেখার ক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করে এই চোখ-এর উপর। বিদ্যালয়ে যাওয়ার দিনগুলি-ই একজন শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আচরণগত উত্তরণের ক্ষেত্রে গঠনশীল সময়। বিদ্যালয়ের এই বছরগুলিতে দৃষ্টিশক্তির যে-কোনোরকম সমস্যাই শিশুর বৌদ্ধিক ক্রমোন্নতি, স্বাভাবিক পূর্ণতা ও তার ভবিষ্যৎ জীবনের সাবলিল গতিকে রুদ্ধ করে দিতে পারে।

দৃষ্টিশক্তির অস্বাভাবিক ত্রুটি –র বিভিন্ন নমুনা

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাজনিত সমস্যা সাধারণত তিন রকমের হয় ঃ

- **মাইওপিয়া বা দৃষ্টিক্ষীণতা ঃ** নিজের শরীরের কাছাকাছি জিনিস ভালোভাবে দেখতে পেলেও দূরের জিনিস এরা দেখতে পায় না।
- **হাইপারমেট্রোপিয়া বা দূরবদ্ধ দৃষ্টি ঃ** এই রোগাক্রান্তরা দূরের বস্তুর মতো কাছের জিনিসও ভালোভাবে দেখতে পায় না।
- **অ্যাসটিগম্যাটিজম্ বা বিষম দৃষ্টি ঃ** ক্ষেত্রবিশেষে এদের স্বাভাবিক দেখার ক্ষমতা থাকলেও – বিশেষত কিছু পড়ার সময়ে এরা মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে থাকে।

প্রধান প্রধান চিহ্ন ও রোগলক্ষণ

ছোটো শিশুদের মধ্যে দৃষ্টিশক্তিজনিত যে-রোগটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সেটি হচ্ছে মাইওপিয়া বা অদূরবদ্ধ দৃষ্টি। শিশুরা দেখার সময় কোনও অসুবিধা হলেও অনেক সময়-ই অভিযোগ করে না। এমনকি তারা এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতনও থাকে না। সেসব বাচ্চার সাধারণভাবে দৃষ্টি দুর্বল। তারা যেসব উপায়ে ভালোভাবে দেখার অসুবিধাগুলি দূর করতে চেষ্টা করে সেগুলি হচ্ছে – • ব্ল্যাকবোর্ডের কাছাকাছি বসে থেকে, • চোখের খুব কাছ থেকে বইপত্র ধরে, • চোখ জোর দিয়ে চেপে রাখে, • চোখের পূর্ণ ব্যবহার প্রয়োজন এমন কাজ থেকে দূরে থাকে।

প্রায়ই মাথাধরা – বিশেষত কোনো কিছু পড়ার সময় এর প্রাবল্য ঘটে।

বিদ্যালয় স্তরে পরীক্ষা

চোখের রোগ সম্পর্কে শিক্ষিকা/শিক্ষকদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কেমন করে পরীক্ষা করতে হয় (দূরের জিনিস দেখতে না পাওয়া) এসম্বন্ধে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষাটুকু শিক্ষিকা/শিক্ষকরা বা স্বাস্থ্যকর্মীরা করতে পারলে ভালো হয়।

উদ্দেশ্য

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা সাধারণত দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত কোনো অসুবিধার কথা কাউকে জানায় না, এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সমস্ত ছেলেমেয়ের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করা যাদের অল্প বয়সেই চোখের অসুখ দেখা দিয়েছে। এই ধরনের ছেলেমেয়েদের চশমার সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি জনিত অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্থান

শিশুদের পরীক্ষা করতে হবে এমন স্থানে যেখানে –

- যথেষ্ট আলো আছে - সাধারণত খোলা জায়গায় দিনের আলোই এই সব পরীক্ষার জন্য প্রকৃষ্ট।
- উপযুক্ত পরিসর - শ্রেণীকক্ষ অথবা লম্বায় ২২ ফুটের বেশি কোনো উন্মুক্ত জায়গা।

কী কী করতে হবে ঃ

দূরের জিনিস দেখার ক্ষমতা পরীক্ষা করতে একটি নির্দিষ্ট চার্ট ব্যবহার করা হয়। দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই চার্টটিকেই ব্যবহার করতে হবে। চার্টটিতে ইংরেজি বর্ণকে বিভিন্ন অবস্থানে দেখানো হয়েছে।

- ২০ ফুট দূরত্ব মেপে নিন।
- নীচে যেমন করে দেখানো হয়েছে তেমনি করে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুর ও শিক্ষকের সমান্তরাল অবস্থান নির্দিষ্ট করুন।
- শিশুদের দেখিয়ে দিন কেমন করে চার্টটিকে দেখতে হবে ও 'E' বর্ণটিকে তিনটে হাত কোনদিকে তা বুঝিয়ে বলুন।
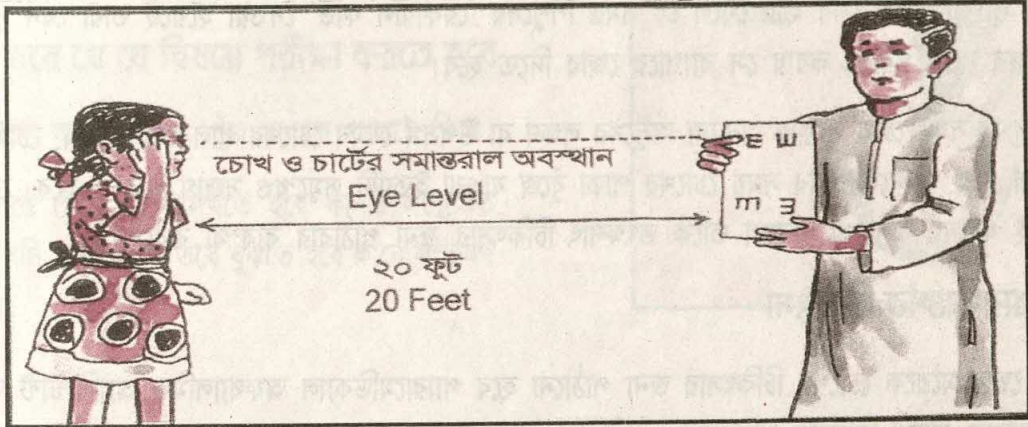
দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা

- প্রথমে ছাত্রছাত্রীকে ডান চোখ বন্ধ করে বাঁ চোখ দিয়ে দেখে বলতে বলুন 'E' এর মুখটা কোন দিকে।
- তারপর বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখে দেখে বলতে বলুন 'E' এর মুখটা কোন দিকে।
- চার্টটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান ও যেভাবে বলা হল সেইভাবে পরীক্ষাটি করতে থাকুন।
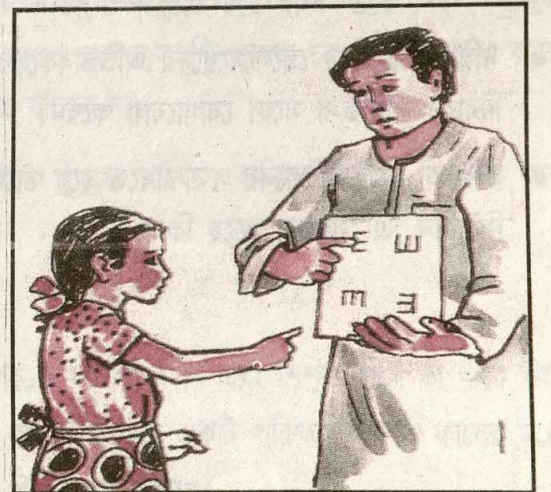
মনে রাখবেন

যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর দুটি চোখের কোনো একটিতে দেখতে অসুবিধা হয়, তবে কোন চোখটিতে অসুবিধা হচ্ছে, সেটা লিখে রাখুন। শিশুটির দৃষ্টিশক্তিতে ত্রুটি - (refractive error) আছে। এর জন্য তার চিকিৎসার প্রয়োজন আছে।

চিকিৎসা

পরীক্ষার পর যে শিশুর দৃষ্টিশক্তিতে ত্রুটি ধরা পড়বে তাকে এই অসুখ দূর করার জন্য চশমা নিতে হবে এবং তাকে কমিউনিটি হেলথ্ সেন্টারে (সমষ্টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে) পাঠাতে হবে। সেখানে প্যারামেডিক্যাল অফথালমিক অ্যাসিস্টান্ট আলোক প্রতিসরণের পরীক্ষা করবেন।

শিক্ষক/শিক্ষিকারা কী করবেন

- দেখতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা তা জানতে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা চলাকালীন সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর দৃষ্টিশক্তি যাচাই করে দেখুন।
- কী কী লক্ষণ থাকলে চোখের অসুখ আছে বলে মনে করা হয়, সেগুলি সম্বন্ধে সকল শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অবহিত হতে হবে। এই সমস্ত লক্ষণের কথা আগে বলা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে যে সমস্ত শিশুদের 'রেফারাল কার্ড' দেওয়া হয়েছে তারা যেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে তাদের চোখ পরীক্ষা করায় সে ব্যাপারে জোর দিতে হবে।
- চোখ পরীক্ষার সময় চোখ সংক্রান্ত অন্যান্য অসুখের লক্ষণ বা উপসর্গ যেমন চোখের লাল ভাব, জ্বালা, চোখ থেকে জল অথবা পুঁজ পড়া, সকালে ওঠার সময় চোখের পাতা বুঁজে যাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধেও সজাগ থাকতে হবে। কোনো শিশুর ক্ষেত্রে এই ধরনের অসুবিধা থাকলে তাকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

স্বাস্থ্য সুবিধার অন্তর্গত চিকিৎসা

- যে সমস্ত ছেলেমেয়েকে চোখের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হবে প্যারামেডিক্যাল অফথ্যালমিক অ্যাসিস্টান্ট অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের চোখে আলোক প্রতিসরণের পরীক্ষা করবেন।
- দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের পরামর্শ দিতে হবে তাঁরা যেন বিনামূল্যে চশমার জন্য জেলা অন্ধত্ব নিবারণ সমিতি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
- চিকিৎসা আধিকারিকদের লক্ষ রাখতে হবে তাঁদের কাছে যেসব শিশু যাচ্ছে তাদের চোখের অন্যান্য কোনও সমস্যা বা ভিটামিন 'এ' স্বল্পতা আছে কিনা।

কান থেকে রস বা পুঁজ পড়া

সমস্যা

কর্ণনালিতে সংক্রমণ হলে কান থেকে পুঁজ বা রস পড়ে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা প্রায়ই দেখা যায়। এই রোগের আশু চিকিৎসা প্রয়োজন। না হলে অন্যান্য জটিলতা যেমন শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া বা স্থায়ী বধিরতা দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ বা উপসর্গ

- কান থেকে রস বা পুঁজ তখনই পড়ে যখন কানে কোনও সংক্রমণ হয়। সেক্ষেত্রে ব্যথা একটি সাধারণ উপসর্গ।
- কানের পুঁজে দুর্গন্ধ থাকতে পারে।
- শিশুর গায়ে জ্বর থাকতে পারে।
- কান থেকে পুঁজ পড়ার পূর্ব ইতিহাস। অসুখ বেশি হলে কর্ণনালিতেও পুঁজ দেখা দিতে পারে।

বিদ্যালয় স্তরে যে যে বিষয়ে পরীক্ষা করতে হবে

- কান থেকে আগে কখনও পুঁজ বা রস পড়েছে কিনা।
- কান আস্তে টেনে ধরে দেখতে হবে কানটি সংক্রমিত কিনা। যদি ব্যথা থাকে তবে বুঝতে হবে কানে সংক্রমণ হয়েছে।
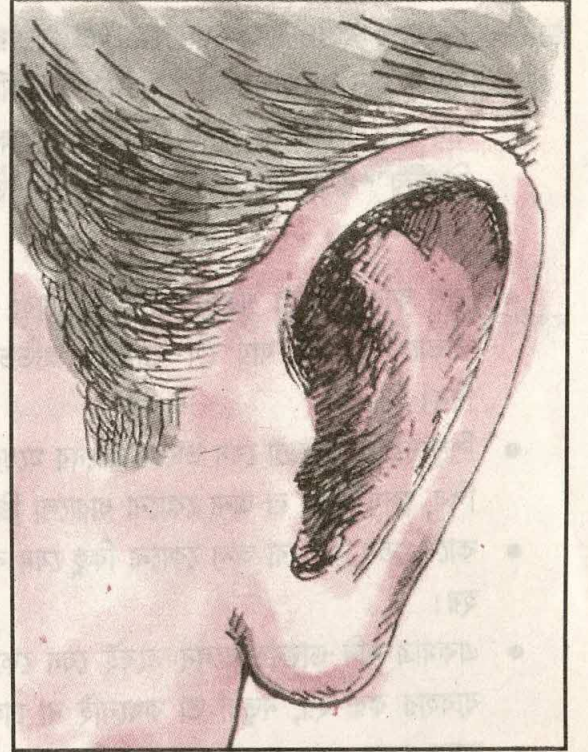
চিকিৎসা

- কোনো শিশুর কান থেকে যদি রস বা পুঁজ গড়ায় অথবা যদি কানে সংক্রমণ হয়ে থাকে তবে সেই শিশুটিকে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। শিশুটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে/সমষ্টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হবে। (শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজে চিকিৎসা করতে যাবেন না)

- অভিভাবকদের পরামর্শ দিতে হবে তাঁরা যেন শিশুর কানটিকে শুকনো রাখেন। বাড়িতে মায়েরা শিশুদের কান শুকনো রাখতে।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি মেনে চলবেন –

– একখন্ড পরিষ্কার, তরল শুষে নিতে পারে এমন কাপড়ের সলতে বানান এবং শিশুর কানে তা ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দিন। এক মিনিট কানে রাখার পর সেটাকে বার করে আর একটি পরিষ্কার সলতে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। এই পুরো প্রক্রিয়াটিতে সাধারণত দশ মিনিট সময় লাগে।

- দিনে অন্তত চারবার এইভাবে কান শুকিয়ে নিতে হবে।
- যখন স্নান করবে, তখন শিশু যেন কানে তুলো গুজে স্নান করে।
- পুকুরে স্নান করা চলবে না।

শিশুটির টিটেনাস প্রতিষেধক নেওয়া আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে নিন। যদি না নেওয়া থাকে তবে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীকে নিশ্চিতভাবে টিটেনাস প্রতিষেধক দিতে হবে।

শিক্ষক /শিক্ষিকারা কী করবেন

- শিশুদের মধ্যে শ্রবণশক্তি কম হয়ে যাওয়ার পেছনে অল্প বয়সে কান থেকে রস বা পূঁজ গড়ানো একটি অন্যতম কারণ। যদি ক্লাসে কোনো শিশুর এই অসুখ লক্ষ করা যায় তবে শিশুটির স্থায়ী বধিরতা দূর করতে সত্বর তাকে চিকিৎসকের কাছে পাঠান।
- শিশু কান কিভাবে শুকনো রাখা যায় এবং শিশুটির চিকিৎসা কীভাবে করানো যায় সে ব্যাপারে অভিভাবকদের পরামর্শ দিন।
- শিশুদের বলুন তারা যেন তাদের কানের মধ্যে কাঠি, পেনসিল, পিন, সেফটিপিন বা অন্য কোনো ধারালো জিনিস না ঢোকায়।
- কানে তেল, জল বা অন্য কোনো কিছু যেন কখনই না দেওয়া হয়।
- একমাত্র যদি ডাক্তার বলেন তবেই যেন কোনো কানের ড্রপ ব্যবহার করা হয়, নতুবা তা কখনোই না ঢালা হয়।

- কানে তেল, জল বা অন্য কোনো কিছু যেন কখনোই না দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য-সুবিধার অন্তর্গত চিকিৎসা

কান থেকে পুঁজ গড়ানো অসুখটা হঠাৎ ঘটেছে হতে পারে অথবা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

১। হঠাৎ ঘটলে (যে ক্ষেত্রে ২ সপ্তাহের কম সময় ধরে কান থেকে রস বা পুঁজ গড়াচ্ছে)

ক) কমে করে ৫ দিন অ্যান্টিবায়েটিক ওষুধ খাওয়ান।
(কট্রিমোক্সাজোল, অ্যামোক্সিসিলিন বা অ্যাম্পিসিলিন মুখে ব্যবহার করতে হবে)

খ) ব্যথা বা বেশি জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল দিন।

গ) যদি পুঁজ থাকে তবে সলতে দিয়ে কান শুকনো রাখুন।

ঘ) পাঁচ দিন পরে আবার দেখুন। যদি লক্ষণগুলি দূর না হয় তবে আরও ৫ দিন ধরে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ চালিয়ে যান। যদি দশ দিনেও কোনো উপকার না হয় তবে ই.এন.টি. বিশেষজ্ঞের কাছে রোগীকে পাঠিয়ে দিন।

২। দীর্ঘস্থায়ী অবস্থায় (যে ক্ষেত্রে ২ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কানে রস বা পুঁজ পড়ছে)

ক) এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা চলবে না।

খ) দীর্ঘকাল ধরে যে কানে পুঁজ পড়ছে, সে কান শুকনো রাখলে রোগের অনেকখানি উপশম হয়। কান কীভাবে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে শুকনো রাখতে হয় তা অভিভাবকদের বুঝিয়ে বলুন। স্বাস্থ্য পরিচর্যাকারী অথবা অভিভাবক উভয়ের পক্ষেই কান শুকনো রাখা ব্যাপারটা হয়তো খুবই সময় সাপেক্ষ, কিন্তু এছাড়া উপায় নেই।

গ) সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী কানের রোগাক্রান্ত ছেলেমেয়েকে নাক, কান, গলা (ENT) বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠান। কানের পর্দা ফেটে গেছে কিনা, সেক্ষেত্রে নিজে নিশ্চিত হবেন না এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণের চিকিৎসার দায়িত্ব নিজে নেবেন না।

দ্রষ্টব্য ঃ হঠাৎ ঘটা বা দীর্ঘস্থায়ী কানের অসুখে এই দুয়ের মধ্যে কোনও ক্ষেত্রেই অ্যান্টিহিস্ট্যামিনিক বা ভ্যাসোকনস্ট্রিকটর কার্যকর নয়।

মনে রাখবেন, সংক্রমিত পাঁচড়া-পুঁজ-বিশিষ্ট ক্ষত এবং কান থেকে পুঁজ পড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিশুর যদি টিটেনাস টক্সয়েড না নেওয়া থাকে তবে অবশ্যই যেন তা দিয়ে দেওয়া হয়।

দাঁতের সমস্যা

সমস্যা

দাঁত সংক্রান্ত তিনটি প্রধান অসুখ লক্ষ করা যায় ঃ

- দাঁতের ক্ষয়রোগ (ডেন্টাল ক্যারিস) • মাড়ির অসুখ • অবিন্যস্ত দাঁত (ম্যাল-ওক্লুসন্)

প্রথম দুটি অসুখের ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হল মুখ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি ঠিক ঠিক মেনে না চলা এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস যেমন ঠিক মত দাঁত না ধোওয়া, বেশি বেশি মিষ্টি খাওয়া, খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার না করা প্রভৃতি। যেসব ছেলেমেয়ের দাঁত খারাপ, তাদের মুখের ভেতরে ব্যাকটেরিয়া জন্মায় ও সেই ব্যাকটেরিয়াগুলি এক ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে। সেই কারণে দাঁতের ক্ষয় হয় ও মাড়ি ফোলে।

দাঁত অবিন্যস্ত হতে পারে শৈশবের নানা বদঅভ্যাসের ফলে যেমন, বুড়ো আঙুল/আঙুল চোষা, দাঁত দিয়ে নখ কাটা, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া, জিভ বার করে থাকা ইত্যাদি।

লক্ষণ ও উপসর্গ

দাঁতের ক্ষয়রোগ

দাঁতের উপরিভাগে বাদামি বা কালো রঙের ছোপ বা গর্ত লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে শিশুরা যে সব বিষয়ে অভিযোগ করতে পারে সেগুলি হল ঃ

- দাঁতে গরম এবং ঠান্ডা, এই দুই অনুভূতিই বেড়ে যায়।
- যন্ত্রণা ঃ অসুখ বেড়ে গেলে দাঁত সবসময়ে দপ্‌দপ্ করে ব্যথা হতে থাকে।
- দাঁতে খাবার আটকে যেতে পারে।

মাড়ির অসুখ

মাড়ির অসুখে সাধারণত ব্যথা থাকে না এবং ছেলেমেয়েদের কোনোরকম অভিযোগও থাকে না। তবে যদি ঠিক সময়ে মাড়ির অসুখের চিকিৎসা না হয়, তাহলে তা হাড় নষ্ট হওয়ার বা দাঁত আলগা হওয়ার কারণ হতে পারে। মাড়ির অসুখ হলে যে লক্ষণগুলি দেখা যায় সেগুলি হল ঃ • মাড়ির রঙ লাল হতে পারে (সাধারণত মাড়ির রঙ হালকা গোলাপি হয়) • মাড়ি ফুলে থাকে • মাড়ি দিয়ে সহজেই রক্ত পড়ে • শিশুর মুখে গন্ধ হয়।

বিদ্যালয় স্তরে পরীক্ষা

দিনের আলোয় জানলার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে প্রত্যেক শিশুকে পরীক্ষা করতে হবে।

যা যা দেখতে হবে

- দাঁত বিবর্ণ হয়ে যাওয়া বা দাঁতে কালো ছোপ আছে কিনা। দাঁতের পাটির সামনে ও পেছনে দুই দিকেই দেখতে হবে।
- দাঁত ক্ষয় হতে হতে সেখানে গর্ত হয়েছে কিনা।
- মাড়ি ফুলেছে কিনা বা মাড়ি দিয়ে রক্ত বা পুঁজ পড়ছে কিনা।
- দাঁতগুলি সমান কিনা।

চিকিৎসা

দাঁতের অসুখের চিকিৎসা সাধারণত উপ-কেন্দ্রে বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সম্ভব নয়। কোনো শিশুর দাঁতে বা মাড়িতে যদি উপরের লক্ষণগুলি দেখা যায় তবে তাকে দাঁতের ডাক্তারের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

শিক্ষক/শিক্ষিকারা যা করতে পারেন

সমস্ত ছেলেমেয়েকে দাঁতের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে যেন সুদূর ভবিষ্যতেও তারা সুফল পেতে পারে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তাঁরা ছেলেমেয়েদের পরামর্শ দিতে পারেন।

খাবারদাবার

সুস্থ ও সবল দাঁত ও মাড়ির জন্য প্রোটিন ও ভিটামিনযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত। দুধ, ননি, ডিম, সবুজ পাতাযুক্ত শাক-সবজি, গাজর, মূলো, ওলকপি এবং ফলফলাদি - (ভিটামিন – সি সমৃদ্ধফল, পেয়ারা) এ সবই দাঁতের পক্ষে উপকারী।

চিনি খাওয়া সম্বন্ধে সাবধানতা

খাবারে মিষ্টির আধিক্য দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকারক। চটচটে বা আঠাল মিষ্টি যেমন টফি, চকোলেট প্রভৃতি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে।

দাঁত পরিষ্কার রাখা

সারাদিনে অন্তত দুইবার দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। সকালে এবং রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে। এজন্য টুথব্রাশ, দাঁতন বা নিমকাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে। মাড়ির দিক থেকে শুরু করে উপরে, নীচে ব্রাশ করতে হবে অর্থাৎ ওপরের দাঁতের পাটি থেকে নীচের পাটিতে এবং নীচের পাটি থেকে ওপরের পাটিতে ব্রাশ যাতায়াত করবে। কষের দাঁতগুলির (চিবোনোর জন্য যে দাঁত ব্যবহার করা হয়) ওপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে হবে।

প্রত্যেক বার খাওয়ার পর জল দিয়ে মুখ কুলকুচি করে আঙুল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার ও মাড়ি মালিশ করতে হবে।

পেটের অসুখ বা ডায়রিয়া

পেটের অসুখ বা পেট খারাপ বা ডায়রিয়া বলতে বুঝি তরল বা জলের মত পায়খানা। দিনে তিনবারের বেশি পাতলা পায়খানা হলে বলতে পারি পেটের অসুখ হয়েছে। যখন সারা দিনে ৩০০ গ্রামের মত মল বেরিয়ে যায় বলতে পারি পেটের অসুখ হয়েছে। এমনকি একবার যদি জলের মত অনেকখানি মল বেরিয়ে আসে, তাহলে সেটাকেও পেটের অসুখ বলা যাবে। যখন মলে আম ও রক্ত থাকে, তখন বলে আমাশয় বা ডিসেনটেরি।

পেটের অসুখ হলে রোগী সাধারণত বার বার পায়খানা যায়, পাতলা পায়খানা – মল থাকে বা জলের মত পায়খানা, বমিভাব, বমি, পেটের বেদনা, জ্বর বা পেট মোচড়ানো থাকতে পারে। বেশি পায়খানা হলে জল পূরণ ঠিকমতো না হলে শরীরে জলের ভাগ কমে, মাংসপেশিতে টান ধরতে পারে।

আমাশয়, জিয়ার্ডিয়া, কলেরা, আন্ত্রিক, রোটা ভাইরাস, পোলিও ভাইরাস প্রভৃতি থেকে ডায়ারিয়া হতে পারে।

কীভাবে ছড়ায় ঃ (১) মাটি কেটে যেখানে সেখানে পায়খানা করা, (২) মলশৌচের পর সাবান দিয়ে ভালো করে হাত না ধোওয়া, (৩) মাছি, আরশোলা প্রভৃতি, (৪) দূষিত মল মেশানো কাপড়-চোপড় নদীতে – পুকুরে বা ডোবায় কাচলে, (৫) নোংরা দূষিত জলে বাসন কোসন ধুলে, (৬) পাদোদক বা সিন্নি থেকে – কারণ এসবে বীজাণুরা তাড়াতাড়ি বাড়ে, (৭) বাসি, পচা খাবার খেলে।

কীভাবে রোধ করা যায় ঃ নিরাপদ জল খেতে হবে – যেমন কলের জল, ডিপ টিউবওয়েলের জল, বা নলকূপের জল। কলসীর মুখ ঢেকে রাখতে হবে। হাতলওয়ালা মগ দিয়ে জল তুলতে হবে হোটেল বা ভোজবাড়ির জল খাওয়া চলবে না। খাবার আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। মলত্যাগের পর ভালোভাবে সাবান দিতে হাত ধুতে হবে। বাজারের কাটা ফল, জল, সরবৎ, বরফ প্রভৃতি খাওয়া চলবে না। জল দূষিত মনে হলে ক্লোরিন ট্যাবলেট জলে দিতে হবে বা দশ মিনিট জল ফুটিয়ে নিতে হবে।

শরীরে জলের অভাব হয়েছে কীভাবে বুঝতে পারা যাবে ঃ

রোগী এলিয়ে পড়ছে বা ঘুমিয়ে পড়ছে, চোখ খুব ভিতরে ঢুকে গেছে এবং শুকনো, চোখে জল নেই, শুকনো, মুখ ও জিভ খুব শুকনো, জল খেতে পারছে না বা চাইছে না। একটা আঙুল বা বুড়ো আঙুল দিয়ে চামড়া চিমটে ধরে ছেড়ে দিলে খুবই ধীরে ধীরে আগের জায়গায় ফিরে যায়।

ডায়ারিয়ার চিকিৎসা

১। শরীরে জলের অভাব হলে জল পূরণ করতে হবে - ORS (Oral Rehydration Solution) খাওয়াতে হবে। এরকম কয়েকটি নাম – COSLYTE, ELECTROBION, ELECTRAL। কত পরিমাণ জলে মেশাতে হবে, কতটা খেলে হবে লেখা আছে। কিনে রাখা ভালো। হাতের কাছে না পাওয়া গেলে যে কোনো ধরনের পানীয় খাওয়াতে পারা যায়, যেমন পাতলা ঝোল, ডাবের জল, ভাতের মাড়, ডালের ঝোল, কিম্বা শুধু জল। অথবা এক গেলাস ভালো জলে এক চা চামচ ভরা চিনি কিম্বা দেড় চামচ গুড়, এতে ১ চিমটে লবণ মেশাতে হবে। প্রতিবার পায়খানা যাবার পর খাওয়াতে হবে। বুকের দুধ বন্ধ করা চলবে না। আর যা যা খাবার শিশু রোজ খায়, খাওয়াতে হবে। এতেও পায়খানা বন্ধ না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া এককোষী পরজীবী। এই পরজীবী লাল রক্তকণাকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে। মানুষ থেকে মানুষে ম্যালেরিয়া ছড়ায়, স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশা। যার ম্যালেরিয়া হয়েছে, মশা তার রক্ত খেলো। রক্ত খাবার ৮ – ১০ দিন পর ঐ মশা সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তার ম্যালেরিয়া হতে পারে। সংক্রামিত মশা কামড়াবার মোটামুটি ৮ – ১০ দিন পর ম্যালেরিয়া হয়। এই মশা মানুষকে রাতের বেলায় কামড়ায়, দিনে নয়।

ম্যালেরিয়া হলে আগে শীত দিয়ে কাঁপুনি জ্বর ও পরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। সাধারণত একদিন বাদে একদিন জ্বর আসে। কখনো সখনো জ্বর নাও আসতে পারে। বা জ্বর সব সময় লেগে থাকতে পারে। মাথায় খুব বেদনা। মাংসপেশীতেও। শরীরের রক্ত কমে। কঠিন বা জটিল ম্যালেরিয়া হলে জ্বরের সঙ্গে ভয়ানক মাথা বেদনা, পাতলা পায়খানা, শ্বাস কষ্ট, রোগীর অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, প্রস্রাব খুব কমে যাওয়া এসব জটিলতা দেখা যায়।

যে জায়গায় ম্যালেরিয়া আছে, সেখানে শিশুরা ম্যালেরিয়ায় বেশি ভোগে।

ম্যালেরিয়া দমনের উপায় ঃ

জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করে জানতে হবে ম্যালেরিয়া হয়েছে কিনা। ম্যালেরিয়া হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা। মশারির ভিতর শুতে হবে। ঘরের ভিতর, ছাদে, ঘরের আশেপশে বা যেখানে মশার লার্ভা জন্মাবে তাদের মেরে ফেলতে হবে। মশার লার্ভা জন্মাতে পারে এমন জলপূর্ণ জায়গায় ঐ লার্ভা ধ্বংসকারী এমন মাছ ছাড়তে হবে বা জলে বায়োলার্ভি সাইড ছড়াতে হবে। সন্ধ্যার পর সারা গা-হাত-মুখে মশা বসতে না পারে সেই ধরনের ওষুধ লাগানো যেতে পারে, যেমন ডাই মিথাইল থ্যালেট, নিমতেল প্রভৃতি। মনে রাখতে হবে ম্যাট, কয়েল, গাড়ি থেকে বা বন্দুক থেকে ধোঁওয়া ছাড়া, কোনোটাই কাজ দেয় না, পরিবেশ দূষিত করে, স্বাস্থ্য খারাপ করে, এক জায়গার মশা আরেক জায়গায় চলে যায়।

স্বাস্থ্যশিক্ষা

স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কাজকর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল স্বাস্থ্যশিক্ষা দান। তাঁরা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ জীবন ধারা গড়ে তোলার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা তাদের জীবনের প্রারম্ভে লাভ করছে সেই শিক্ষাই তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যে সম্পর্কিত জ্ঞান, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভ্যাসকে প্রভাবিত করবে। ক্রমে তাদের সেই জ্ঞান পরিবারের ও সমাজের উপকারে লাগবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের এই কাজের সঙ্গে যে দায়িত্ব জড়িয়ে থাকে তা কোনো অংশে কম নয়। তবে যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকারা স্বাস্থ্যশিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর প্রথম থেকেই জোর দেন তবে শুধু যে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর জীবনেই একটি পরিবর্তন আসবে তাই নয়, তাদের পরিবার তথা সমগ্র সমাজ সেই শিক্ষায় উপকৃত হবে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়

১। হাত ধোয়া ঃ মল ত্যাগ করার পর এবং খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস শিশুদের মধ্যে তৈরি করতে হবে।

২। প্রত্যেক দিন স্নান করতে হবে।

৩। মুখ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি (মুখ ও দাঁত) ঃ প্রত্যেক দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে দাঁত মাজা জরুরি। টুথব্রাশ বা দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে হবে।

৪। জুতো পরতে হবে ঃ খালি পায়ে কখনোই হাঁটা উচিত নয়। বিশেষ করে বাড়ির বাইরে বেরোবার সময় সর্বদা জুতো পরে বেরোতে হবে।
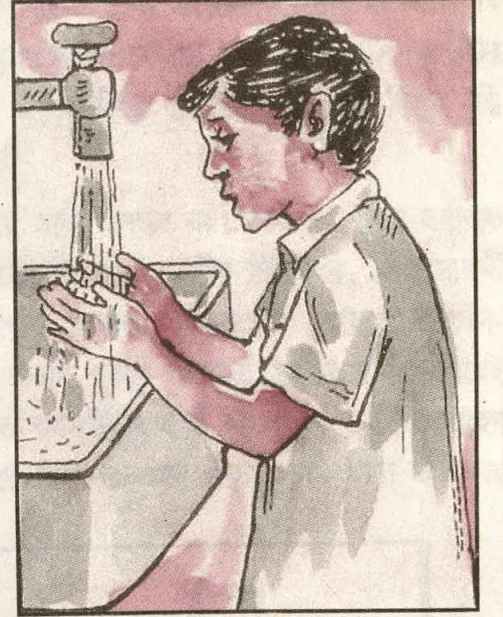
বক্রকৃমি রোধ করার ব্যাপারে এটি একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ। বক্রকৃমি থাকলে শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতা দেখা দেয় ও পরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে তা ছড়ায়।

৫। বেডশিট, গামছা এবং অন্যান্য কাপড়-চোপড় সর্বদা পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হবে ও অন্য কারোর সঙ্গে তা অদল বদল না করে ব্যবহার করতে পারলে ভালো। এতে দাদ ইত্যাদি চর্মরোগের প্রতিরোধ করা যায়।

৬। মেঝেতে বা পথে যেখানে সেখানে থুতু ফেলা চলবে না। এতে রোগ ছড়াতে পারে। হাঁচবার বা কাশবার সময় মুখে হাত বা কাপড় (রুমাল) চাপা দিতে শেখাতে হবে।

৭। নখের স্বাস্থ্য ঃ নিয়মিত নখ কাটা উচিত।

৮। নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারে প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা উচিত।

৯। পান করবার এবং রান্নার জল যথাসম্ভব পরিষ্কার কোনো উৎস থেকে নেওয়া উচিত। এতে শিশুদের অনেকগুলি রোগের থেকে রক্ষা করা যায়। হাত-পাম্প, সুরক্ষিত কূপ আর কল হল পরিষ্কার জলের ভাল উৎস। যদি বাড়িতে জল ধরে

রাখতে হয় তবে তা পরিষ্কার পাত্রে রাখা উচিত। প্রতিদিন পাত্রগুলি খালি করে জলে ধুয়ে নিতে হবে। পাত্রটি ঢেকে রাখতে হবে এবং জল নেওয়ার সময় পাত্রে হাত চোবানো চলবে না। পাত্র থেকে জল নেওয়ার জন্য একটা লম্বা হাতলওলা হাতা বা হাতলওয়ালা মগ ব্যবহার করতে হবে। জলের যদি কোনো নিরাপদ উৎস আদৌ না থাকে, তাহলে পান করার আগে জলটা ফুটিয়ে নিতে হবে। এটা মনে রাখা খুবই জরুরি যে অন্ততঃ ১০ মিনিট জল না ফোটানো হলে তা পানের পক্ষে নিরাপদ হতে পারে না।

১০। খাবার ঢেকে রাখুন ঃ মাছি এবং অন্যান্য কীট-পতঙ্গ থেকে খাবার সাবধানে রাখতে হবে কারণ এগুলি রোগ ছড়ায়।

১১। মলত্যাগের জন্যে শৌচাগার ব্যবহার করুন। খোলা জায়গায় মলত্যাগ করবেন না। জলের কোনো উৎসের কাছাকাছি কখনও মলত্যাগ করবেন না।

পুষ্টিহীনতা ও তা দূর করার সম্ভাব্য গ্রহণীয় ব্যবস্থা

ভারতে শিশুদের সাতচল্লিশ শতাংশের বেশি পুষ্টিহীনতার শিকার বলে একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় প্রকাশ। এই শিশুদের একটা উল্লেখ্য অংশ যে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে রয়েছে সেকথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমাদের দেশে বিশেষ করে বালিকা শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতা তুলনামূলকভাবে বেশি, এর কারণ তুলনামূলকভাবে বালিকা সন্তানদের প্রতি অবহেলা এবং বালক-বালিকাদের মধ্যে বৈষম্য করা হয় বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। পুষ্টিহীনতা একদিকে যেমন রোগব্যাধির সৃষ্টিকারক, অন্যদিকে ঐ রোগব্যাধিগুলি আবার পুষ্টির পরিপন্থী।

শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার একটি বড়ো কারণ দারিদ্র্য হলেও সেটিই একমাত্র কারণ নয়। খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাব, সমাজের এ বিষয়ে সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, বিদ্যালয়গুলিতে এ সম্পর্কিত শিক্ষার অভাব, এসব কিছুই এজন্য দায়ী। ইউনিসেফ এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য উল্লেখ করেছেন যা আমাদের বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য - ব্রাজিলে ১৯৭৩ সালে ওজন খুব কম এমন শিশুদের সংখ্যা যেখানে ১৭ শতাংশ ছিল (অপুষ্টির কারণে), ১৯৯৬ –তে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৬ শতাংশে, যে সময়কালে ঐ দেশটিতে দারিদ্র্যের হার প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পুষ্টিহীনতা দূর করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হলেও অনেকাংশে কমিয়ে আনা অসম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে সর্বাত্মক এবং সমন্বিত প্রয়াস গ্রহণ জুরুরি। বিদ্যালয় স্বাস্থ্যশিক্ষায় অভিভাবক, পঞ্চায়েত/পুরসভা, স্থানীয় চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে সমন্বিত করে পুষ্টি শিক্ষা ও পুষ্টি প্রকল্প কার্যকরভাবে রূপায়ণে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের সচেষ্ট হতে হবে। কীভাবে সস্তায় পুষ্টি মিলতে পারে, পুষ্টির অভাব পূরণে সমাজের সহায়তায় বিদ্যালয়েই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাবার শিশুদের দেওয়া যায় কিনা এসব সম্পর্কে সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে।মোটামুটিভাবে কম খরচে মিলতে পারে শিশুদের এমন একটি সুষম খাদ্য তালিকার নমুনা এখানে প্রদত্ত হল ঃ
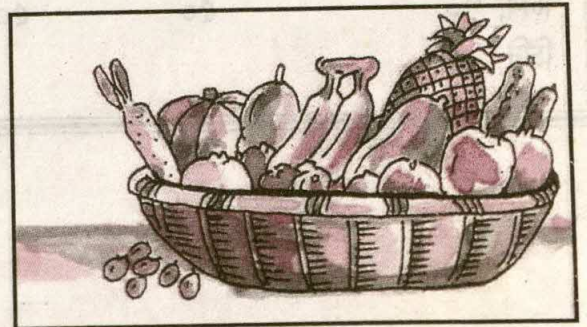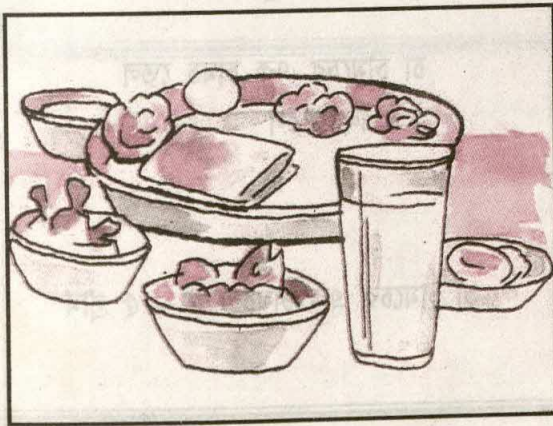
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য তালিকার একটা ধারণা

খাদ্যদ্রব্য (গ্রাম)	৫-১০ বছরের বালক-বালিকার জন্য		
	নিরামিষ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	
চাল, আটা, চিড়ে, মুড়ি	২০০-২৫০	২০০-২৫০	৫০ গ্রাম চাল - এক কাপ ভাত
ডাল	৭০	৬০	২৫ গ্রাম আটা - একটা রুটি
শাক	৫০	৫০	৫০ গ্রাম ডাল - এক কাপ ডাল
অন্যান্য সবজি যেমন আলু, রাঙাআলু, কচু ইত্যাদি	৫০	৫০	
ফল	৫০ (একটা ফল)		৫০ (একটা ফল)
দুধ	২৫০ মিঃ লিঃ	২৫০ মিঃ লিঃ	১০০-১২৫ মিলি লিটার দুধ - এক কাপ দুধ
তেল, ঘি, মাখন	৩০	৩০	চা চামচের এক চামচ তেল - ৫ লিঃ তেল
মাছ, ডিম, মাংস	—	৩০	
চিনি, গুড় চিনি	৫০	৫০	চা চামচের এক চামচ চিনি - ৫ গ্রাম

কর্মতালিকা – ৫

আপনাদের এলাকার বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা কী ধরনের পুষ্টিহীনতায় ভোগে বলে আপনাদের মনে হয়? ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে এ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বোঝা যায় কিনা সে সম্পর্কে আপনারা কী মনে করেন? ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তাদের দৈনন্দিন খাবার তালিকা জেনে নিয়ে কোন্ বিশেষ খাদ্যের বা কোন্ ভিটামিনের অভাব থাকছে বুঝে নিয়ে অভিভাবকদের কীভাবে সে সম্পর্কে অবহিত করা যায় কিনা দেখুন। আপনাদের এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, এঁদের সাহায্য নিয়ে পুষ্টি বিষয়ে বিশদভাবে জানা যায় কিনা এবং এলাকার জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত/পুরসভা এদের সাহায্য নিয়েই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে কিছু করা যায় কিনা এসব, বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা করুন। আলোচনার ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ করুন।

পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত পোস্টার সংগ্রহ করুন বা প্রস্তুত করুন (যেমন, ইউনিসেফের পোস্টার) এবং সেগুলি পঠন-পাঠনকালে ব্যবহার করুন বা বিদ্যালয়ে উপযুক্ত স্থানে লাগিয়ে দিন।

জাতীয় টিকা কর্মসূচি

শিশুর জন্য ঃ

- জন্মের সময় ঃ বি.সি.জি. এবং ও.পি.ভি. – ০ ডোজ
- ৬ সপ্তাহ বয়সে ঃ বি.সি.জি. ডি.পি.টি. – ১ এবং ও.পি.ভি. – ১
- ১০ সপ্তাহ বয়সে ঃ ডি.পি.টি. – ২ এবং ও.পি.ভি. – ২
- ১৪ সপ্তাহ বয়সে ঃ ডি.পি.টি. – ৩ এবং ও.পি.ভি. – ৩
- ৯ মাস বয়সে ঃ হামের টিকা
- ১৬ – ২৪ মাস বয়সে ঃ ডি.পি.টি. এবং ও.পি.ভি.
- ৫ – ৬ বছর বয়সে ঃ ডি.টি.

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

স্বাস্থ্য অনেকাংশেই পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সুন্দর দূষণমুক্ত পরিবেশ সুস্বাস্থ্যের অনুকূল, অপরদিকে দূষিত পরিবেশ সুস্বাস্থ্যের পরিপন্থী, বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারক। আসলে, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান – জল, বাতাস, মাটি এসব থেকেই আমরা বেঁচে থাকবার রসদ পাই। কাজেই এসব যদি বিভিন্ন কারণে দূষিত হয়ে পড়ে তবে তা চিন্তার বিষয়। কাজেই আমাদের নিকট পরিবেশের জল, বাতাস, মাটি এসব দূষিত হচ্ছে কিনা, এধরনের দূষণ বন্ধ করতে বা কমিয়ে আনতে আমাদের কিছু করণীয় আছে কি না, আমাদের স্বাস্থ্যের উপরে এসব দূষণের ফল কেমন হতে পারে এসব জানতে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আর আমাদের বাড়িঘর, বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর, পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে। এসব কথা ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে হবে। এজন্য পরিকল্পিত কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, এলাকার পরিবেশ সমীক্ষা। এই সমীক্ষায় দেখা যেতে পারে – এলাকায় কটি কলকারখানা আছে এবং সেগুলির কোনওটি থেকে খারাপ কিছু বেরুচ্ছে বলে মনে হচ্ছে কি না বা আশেপাশের মানুষ অভিযোগ করছেন কি না; এলাকায় গাছপালা বনজঙ্গালের পরিমাণ কেমন, কমে আসছে কি না; এলাকায় জনবসতির ঘনত্ব কেমন – সার্বিকভাবে এবং বিশেষ কিছু স্থলে, বিদ্যালয়ে এলাকায় জলের উৎসগুলি কী কী এবং এগুলির জল কোন্ কোন্ কাজে এবং কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে; বিদ্যালয়ের ক্লাসরুম প্রস্রাবখানা, পায়খানা এসব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি না ইত্যাদি। এলাকায় এসবের অবস্থা কেমন, রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন কি না, কোথাও কোথাও জঞ্জালের স্তূপ জমে আছে কি না, উঁচু আওয়াজের শব্দ কোথায় কেমন, চাষের ক্ষেতে জলের উৎসের কাছে কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয় কি না ইত্যাদি। এলাকা পর্যবেক্ষণের পর শিক্ষিকা-শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আলোচনা করতে দেবেন বিদ্যালয় এবং এলাকায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে কি না (জল, বাতাস, মাটি, শব্দ এসবের দূষণ হচ্ছে কি না) এবং এসবের ফলে জনস্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হতে পারে কি না; কোন্ কোন্ উৎসের জল নিরাপদ এবং কোন্‌গুলির জল নিরাপদ না হবার সম্ভাবনা, এসব বিষয়ে কী করণীয় এসব সম্পর্কে।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সাফাই কর্মসূচির মাধ্যমে মাসে একটি দিন বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা বা কাছের বস্তি পরিষ্কার করানো যেতে পারে। বিদ্যালয়ে বা বাড়িতে গাছ লাগানো, বিশেষ করে ফুলগাছ বা বাহারি গাছ লাগানোর কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। জল পরিষ্কার কি না সে সম্পর্কিত ছোটোখাটো পরীক্ষা করতে তাদের সাহায্য করা যেতে পারে। পরিবেশ সম্পর্কিত ছবি, পোস্টার এসব দেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে, সম্ভব হলে মাঝে মাঝে এ সম্পর্কিত ফিল্ম দেখাতে পারলে ভালো হয়।

জল বাহিত কতকগুলি সাধারণ রোগ যেমন, আমাশা, কলেরা, আন্ত্রিক, জন্ডিস, জিয়াডিয়া, পোলিও এসব থেকে রক্ষা পেতে নিরাপদ পানীয় জল গ্রহণ আবশ্যিক। শহরে পুরসভার সরবরাহ করা কলের জল সাধারণত নিরাপদ। গ্রামাঞ্চলে আর্সেনিক দূষণের সমস্যা না থাকলে নলকূপের জল নিরাপদ। তবে গভীর নলকূপের জল লভ্য হলে এই জলই পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে ভালো হয়। বর্ষাকালে যখন পেটের অসুখ আন্ত্রিক এসব হবার বেশি সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন জল ফুটিয়ে খেতে পারলে ভালো হয়। জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য জল এক ঘন্টা রোদে রেখে গরম করবার পর ১০-১৫ মিনিট ফোটানো যেতে পারে। দূষিত জলে স্নান করাও ঠিক নয়। চরণামৃত হিসেবেও অশোধিত গঙ্গাজল ব্যবহার ঠিক নয়, কারণ গঙ্গাজল দূষিত হয়ে পড়ছে। জলের ব্যবহার সম্পর্কেও সাবধান থাকা দরকার। জলপাত্রে মগ বা হাত ডুবিয়ে জল না তুলে কলসি বা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নেওয়া উচিত। আর জলের অপচয় বন্ধ করতে হবে।

রং করা শাকসবজি বারে বারে পরিষ্কার জলে ধুয়ে তবেই রান্নার জন্য ব্যবহার করা উচিত, না হলে ঐসব রং আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। তেমনই রং করা খাবার বা পানীয় না খেতে পারলেই ভালো। প্লাস্টিকের ডিশ, গেলাস এসব ব্যবহার না করে সাবেকি কলাপাতা বা শালপাতা, মাটির গেলাস এসবের ব্যবহার অনেক ভালো। কারণ পরিবেশের পক্ষে এগুলি ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু প্লাস্টিকের জিনিস ক্ষতিকারক।

কর্মতালিকা – ৬

আপনাদের এলাকায়/বিদ্যালয়ে পানীয় জলের অবস্থা, টয়লেট ও নিকাশি ব্যবস্থা, জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থা· এসবের অবস্থা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করুন, বিদ্যালয় এবং এলাকার পরিবেশ সুন্দরতর করতে কী কী অবশ্য করণীয় বলে আপনারা মনে করেন? আপনাদের এলাকায় কোন্ রোগগুলি খুব বেশি করে হয় এবং সেই রোগগুলি প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ –এর জন্য কী কী করা আবশ্যিক বলে আপনাদের মনে হয়? এ বিষয়ে আপনারা আপনাদের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কিছু করতে পারেন কি? পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দু-একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচির পরিকল্পনা উপস্থাপিত করুন। পারস্পরিক আলোচনার ফলাফল লিপিবদ্ধ করুন।

পরিবেশ সচেতনতা

পরিবেশ সুন্দর রাখা সম্পর্কে, দূষিত পরিবেশ সম্পর্কে সতর্ক থাকা বিষয়ে এই ধরনের কিছু শিক্ষাদান এবং পরিবেশ সম্পর্কে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গড়ে তোলা দরকার।

পরিবেশ সচেতনতার ওপর আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারি। ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করতে পারি বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও আমরা পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারি। ছোটো নাটিকা, ছড়া, কবিতা, গান ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে। করা যেতে পারে বৃক্ষরোপণ উৎসব।

অনুষ্ঠানের নাম ঃ পরিবেশ বাঁচাও / পরিবেশ দিবস / পরিবেশ ভাবনা / বৃক্ষরোপণ / গড়ে তোলো পরিবেশ / একটুখানি ভাবো ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানের দিন ঃ পাক্ষিক / মাসিক।

অনুষ্ঠানের সময় ঃ শিক্ষার্থীরাই ঠিক করবে (সকাল, দুপুর বা বিকাল)।

অনুষ্ঠানের সময়সীমা ঃ এক থেকে দেড় ঘন্টা।

নিমন্ত্রণ পত্র ঃ ছাত্ররাই নিমন্ত্রণ পত্র তৈরি করবে এবং তা অভিভাবক/অভিভাবিকার মধ্যে বন্টন করবে।

উদ্বোধনী ভাষণ ঃ শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রথমে পরিবেশ সচেতন হবার প্রয়োজনীয়তা খুব সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন অল্প সময়ে (এলাকার বিশিষ্ট মানুষদেরও এমনতর অনুষ্ঠানে জড়িয়ে নেওয়া যাবে)।

উদ্বোধনী সঙ্গীত ঃ যেমন রবীন্দ্রনাথের পরিবেশের উপর প্রচলিত গান।

আবৃত্তি

গান

নাটিকা

পোস্টার ঃ অনুষ্ঠানের সময় নানা ধরনের পোস্টার চারপাশে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। পোস্টার ছাত্রছাত্রীরাই তৈরি করবে।

পোস্টারে যেসব বার্তা দেওয়া যায় নমুনা হিসাবে সেসবের দু-একটি এখানে উপস্থাপিত হল ঃ

- "ঠিক রাখো পরিবেশ – তবেই বাঁচবে দেশ",
- "নষ্ট হলে পরিবেশ – কষ্টের নাইকো শেষ"।
- "একটি গাছ অনেক প্রাণ, - বেশি করে গাছ লাগান"।
- "নেওয়া হলেই জল – বন্ধ করো কল"।

"আনন্দেতে ভীষণ জোরে
মাইক বাজাই যদি,
নানাভাবে নোংরা করি
পুকুর এবং নদী;
গাছপালা সব কেটে ফেলি
নোংরা করি মাটি,
বনের পশু-পাখিদেরকে
মারি কিংবা কাটি ;
নষ্ট হবে আমাদের এই সুস্থ পরিবেশ,
এসব দূষণ তাড়াতাড়ি তাই করা চাই শেষ।"

এছাড়া পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য জ্ঞাপক প্রশ্নাবলির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তার মাধ্যমে আমরা বিদ্যালয় এবং তার আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কিত কিছু তথ্য পেতে পারি এবং সমাজকে যুক্ত করে সমাজের মানুষের ওপর দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে দিয়েই এসব সম্পর্কিত ছোটে খাটো সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

'জনচেতনা সপ্তাহ' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব এবং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারি। এর ফলে সুন্দর সুস্থ সমাজ গঠন করা সম্ভব।

এলাকার শিক্ষক-শিক্ষিকারা/সমীক্ষকরা পঞ্চায়েত তথা পৌরপ্রধানের সঙ্গে পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং তার একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন। সেই সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের অবশ্য পালনীয় স্বাস্থ্যবিধিগুলি চিহ্নিতকরণ ও তালিকাভুক্তির খসড়া

প্রাক্-কথন বিষয় ঃ শিক্ষার্থীদের অবশ্য পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি।

বিষয়টি ত্রিমাত্রিক ঃ (ক) শিক্ষার্থীদের অবশ্য পালনীয়

(খ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের করণীয়

(গ) অভিভাবক-অভিভাবিকা তথা মা-বাবাদের সচেতনতা ও তৎপরতা

শিক্ষার্থীদের অবশ্য পালনীয় ঃ (সু-অভ্যাস গঠন এবং কু-অভ্যাস বর্জন)

১। ভালোভাবে হাত ধুয়ে খাবার খাওয়া,

২। নখ একটু বড়ো হলেই তা কাটা এবং দাঁত দিয়ে নখ না খোঁটা (বা কাটা),

৩। আঙুল না চোষা এবং থুতু দিয়ে বই খাতার পাতা না ওলটানো,

৪। চুল পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখা এবং সময়মতো মাথা আঁচড়ানো,

৫। নিয়মিত স্নান করা এবং দেহের ময়লা পরিষ্কার করা,

৬। পরিষ্কার ঠান্ডা জল দিয়ে চোখ ধোওয়া এবং পরিষ্কার রাখা, যাতে চোখে পিচুটি না কাটে সে দিকে লক্ষ্য রাখা,

৭। মাজন দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা (সকালে ও রাতে খাওয়ার পর),

৮। কাশি বা হাঁচির সময় মুখে হাত বা রুমাল/পরিষ্কার কাপড় চাপা দেওয়া।

৯। জামাকাপড় পরিষ্কার রাখা এবং পরিষ্কার জামাকাপড় পরা,

১০। পানীয় জল ঢেকে রাখা এবং কলসী বা কুঁজো থেকে জল ঢেলে খাওয়া,

১১। পায়খানা করার পর সাবান বা মাটি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোওয়া,

১২। যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ না করে শৌচাগার বা নির্দিষ্ট স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা এবং প্রয়োজন মতো জল দিয়ে দেওয়া,

১৩। নির্দিষ্ট জায়গায় কফ, থুতু ও ময়লা ফেলা (যেখানে সেখানে ফেলা নয়),

১৪। নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত খাবার খাওয়া এবং বাসি, পচা, আঢাকা খাবার, রাস্তার কাটা ফল, ফুচকা, রঙিন খাবার বা রঙিন পানীয় না খাওয়া — খাওয়ার ঠিক পরেই খেলাধুলা বা ছোটাছুটি না করা,

১৫। খাওয়ার পরপরই কুলকুচি করে মুখ ধোয়া – যাতে খাবারের টুকরো দাঁতের ফাঁকে বা মুখের মধ্যে থেকে না যায়,

১৬। সারাদিনে যথেষ্ট পরিমান (কমপক্ষে ৫/৬ গ্লাস) জল খাওয়া,

১৭। লেখাপড়া করার সময়, শ্রেণীকক্ষে এবং অন্যত্রও মেরুদন্ড সোজা করে বসা - হাঁটার সময়ও মেরুদন্ড সোজা রাখা,

১৮। অধিক রাত না জেগে ঠিক সময়ে ঘুমানো এবং সকালে ঠিক সময়ে শয্যা ত্যাগ করা,

১৯। লেখাপড়া করার সময় আলো যাতে সরাসরি পাঠ্যবস্তুর ওপর পড়ে, সেদিকে নজর রাখা এবং সঠিক দূরত্ব (সাধারণত ৮/৯ ইঞ্চি) বজায় রেখে লেখাপড়া করা। খুব কম আলোয় বা খুব জোরালো আলোয় পড়াশুনা না করা,

২০। খুব কাছ থেকে টিভি না দেখা এবং উচ্চগ্রামে টিভি, রেডিও, ক্যাসেট ইত্যাদি না বাজানো বা না শোনা,

২১। কী বিদ্যালয়ে, কী বাড়িতে জুতো খুলে রাখার নির্দিষ্ট জায়গায় জুতো খুলে রাখা, যাতে বিদ্যালয় বা বাড়ির মেঝে নোংরা না হয়,

২২। মশারি টাঙিয়ে শোওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা,

২৩। ধূমপান করা হচ্ছে এমন পরিবেশের মধ্যে না থাকতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা,

২৪। প্রতিদিন নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করা - এ বিষয়ে পঠন-পাঠনের সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হল, যেমন-

(অ) ভারসাম্যমূলক কার্যকলাপ, অনুকরণ জাতীয় খেলা, ছড়ার মাধ্যমে খেলা, গল্পচ্ছলে খেলা, তাড়া করা জাতীয় খেলা, ছন্দোবদ্ধ কার্যকলাপ – নাচ, গান, ব্রতচারী ইত্যাদি।

(আ) কিছু সরল মানের অ্যাথলেটিক্স্ ও যোগাসন ইত্যাদি করা।

কর্মতালিকা – ৭

এই ধরনের অভ্যাসগুলিকে 'কী করব' এবং 'কী করব না' এইভাবে দুটি স্তম্ভে (কলমে) শ্রেণীবদ্ধ করুন এবং আরও কিছু বিষয় তালিকায় আনা প্রয়োজন মনে করলে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

ছড়া-ছবি-গান প্রস্তুত করে আনন্দদায়ক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুঅভ্যাস গঠন / কুঅভ্যাস বর্জন সম্পর্কে শিখতে কীভাবে আপনারা সাহায্য করতে পারেন সে সম্পর্কে দলভিত্তিক আলোচনা করুন। সম্ভব হলে দু-একটি নমুনা প্রস্তুত করুন। আলোচনার ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ করুন।

নমুনা হিসেবে দু-একটি ছড়া (ছবি সহ) এখানে প্রদত্ত হল ঃ

<u>দাঁত মাজা</u>

প্রতিদিন ভোরে উঠে দাঁত মেজো ভাই

রাত্রে খাবার পরও দাঁত মাজা চাই।

কীভাবে মাজবে দাঁত জেনে নিতে হবে

তবেই সবার দাঁত মজবুত রবে।

<u>কান</u>

কানটাতে মিছেমিছি,

কর কেন খোঁচাখুঁচি

কালা হতে চাও নাকি অকালে?

পুকুরে নদীতে স্নান

যদি কর, সাবধান!

কানের ভেতরে জল গেলে

ক্ষতি যদি হয় শেষকালে !

শিক্ষার্থীদের অবশ্য পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি পালনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে – বিষয়টি একান্তভাবে স্বাস্থ্যবিধি পালনের সাথে সম্পর্কিত

শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের (বিশেষ করে মা ও বাবাদের) করণীয় এবং যৌথ দায়িত্ব ঃ

১। প্রতিদিন প্রার্থনার পর বা একত্র সমাবেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সাধারণভাবে কিছু নির্দেশ দেবেন।

২। পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়ে শ্রেণীকক্ষ যথাসম্ভব স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এবং সুন্দরভাবে সাজাবার ব্যবস্থা করবেন – ।

৩। বিদ্যালয়গৃহ, প্রাঙ্গন ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করবেন পড়ুয়াদের সহযোগে।

৪। প্রার্থনা বা সমাবেশের পর শিক্ষার্থীদের নখ, চুল, দাঁত, জিহ্বা, চোখ ও পরিধেয় পোষাকের পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করবেন এবং শিক্ষার্থী বিশেষে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

৫। বিদ্যালয়ের শৌচাগার ও পানীয় জলের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হবেন। অন্যথায় পরিস্থিতি অনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬। পানীয় জল ও শৌচাগার ঠিক মতো ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

৭। টিফিনের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বাইরের কাটা ফল, ফুচকা, রঙিন পানীয় বা রঙিন খাবার না খায় সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

৮। সপ্তাহের শেষে সময়-সারণিতে অন্তত একটি পিরিয়ডের সংস্থান রেখে যৌথভাবে শিক্ষার্থীদের সমাবেশে স্বাস্থ্য পালনের ক্ষেত্রে তাদের কতকগুলি সাধারণ ত্রুটি ও কু-অভ্যাসের বিষয়ে আলোচনা করবেন।

৯। জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে টিকাকরণ (বুস্টার ডোজসহ) প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা পৃষ্ঠা ৩২ দ্রষ্টব্য)।

১০। মাসে মাসে বা মাঝে মধ্যে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক-অভিভাবিকা (বিশেষ করে মায়েদের সাথে) একটি যৌথ স্বাস্থ্যসভার আয়োজন করে নিজ নিজ গৃহে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি পালনের বিষয়টি অবহিত করবেন এবং সহযোগিতা আহ্বান করবেন।

১১। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিদ্যালয়গৃহে বা প্রাঙ্গণে এমন কিছু খাবেন না বা ব্যবহার করবেন না, যা শিক্ষার্থীদের অনুকরণে প্রলুব্ধ করে তাদের বিপথগামী করে তোলে (যেমন, ধূমপান করা, খৈনি খাওয়া, ঠান্ডা পানীয় খাওয়া ইত্যাদি)।

মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে মানসিক সমস্যাগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় ঃ

আবেগের সমস্যা

- অস্বাভাবিক উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অজানা ভয় ও আতঙ্কের অনুভূতি, নিরাপত্তাবোধের অভাব
- পরীক্ষাভীতি
- ফোবিয়া – কোনো একটি বিশেষ প্রাণী, বস্তু, স্থান বা পরিস্থিতিকে ভয়ের কারণে এড়িয়ে চলা
- কোনো কাজ প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পরেও অকারণে তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকা
- হীনম্মন্যতা
- অল্পেতেই রাগ, বিরক্তি
- বিষণ্ণতা, আত্মহত্যার প্রবণতা
- ঘুমের সমস্যা
- শারীরিক কারণ ছাড়াই নানা শারীরিক উপসর্গ – যেমন, মাথাব্যথা, পেটব্যথা, বমির ভাব বা বমি, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ, জিব শুকনো, হাত-পা-শরীর কাঁপা, ঘনঘন প্রস্রাব বা মলত্যাগের ইচ্ছা ইত্যাদি।

এছাড়াও আরও কিছু সাধারণ সমস্যা – যেমন, বিছানা ভেজানো, তোতলামো ইত্যাদি।

আচরণের সমস্যা

- **অমনোযোগ ও দুরন্তপনার সমস্যা**
  - ❑ অতি দুরন্তপনা
  - ❑ ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই হঠকারি কাজ করা
  - ❑ অত্যধিক রাগ
  - ❑ অমনোযোগিতা
  - ❑ অন্যদের বিরক্ত করা
- **অসামাজিক আচরণের সমস্যা**
  - ❑ বড়োদের কথা না শোনা
  - ❑ কথায় কথায় তর্ক করা

- ❑ অবাধ্যতা, জেদ
- ❑ জিনিসপত্র ভাঙচুর করা, অল্পেতেই রেগে যাওয়া
- ❑ নিয়মশৃঙ্খলা না মানা
- ❑ মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, অকথ্য গালিগালাজ করা
- ❑ মারপিট করা
- ❑ স্কুল পালানো, বাড়ি থেকে পালানো

শিক্ষিকা-শিক্ষকদের সমস্যা

- শোনার ধৈর্যের অভাব
- আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং তিরস্কার ও অত্যধিক শাস্তিদানের প্রবণতা
- ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুধু ভয় নয়, প্রায় ত্রাসের সঞ্চার করা
- পক্ষপাতিত্ব
- বেশি প্রশ্রয় দেওয়া
- অন্যের সঙ্গো তুলনা করা
- শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পারস্পরিক সম্পর্কে সমস্যা
- হীনম্মন্যতা এবং সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব
- বিষণ্নতা
- উদ্বেগজনিত সমস্যা
- কথা ও কাজের মধ্যে অসামঞ্জস্য
- ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ব্যর্থতা

সমস্যাগ্রস্ত পড়ুয়াদের নানান সমস্যায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা যা যা করতে পারেন

- সমস্যাগ্রস্ত পড়ুয়াকে চিহ্নিত করুন
- তাকে একান্ত একটি জায়গায় (যেখানে তৃতীয় কারোর উপস্থিতি থাকবে না) নিয়ে গিয়ে বসুন এবং তার সমস্যাকে বোঝার চেষ্টা করুন
- ছাত্র বা ছাত্রীটির সঙ্গো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করুন যাতে সে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে এবং নিঃসংকোচে নিজের সমস্যার কথা বলতে পারে

- ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সমস্যা না বুঝেই সমাধানের চেষ্টা না করে তার মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করুন
- বকাবকি বা মারধোর করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া নয় – দরদি মন নিয়ে তার সমস্যাকে বুঝতে চেষ্টা করুন
- ছাত্র বা ছাত্রীটির মনের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন এবং আপনি যে তার মনের অনুভূতিকে অনুভব করতে পারছেন – তা যেন আপনার হাবভাবের মধ্যে দিয়ে সেই ছাত্র বা ছাত্রীটি বুঝতে পারে
- এই সহায়তা প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা মেনে চলাটা প্রাথমিক পর্ব। অন্যদের উপস্থিতিতে, তা সে ক্লাসরুম হোক বা স্টাফরুম কোথাও-ই সমস্যাগ্রস্ত ছাত্র বা ছাত্রীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় নয়। একান্তই অন্য কারোর সাহায্য প্রয়োজন হলে সমস্যাগ্রস্ত ছাত্র বা ছাত্রীর পরিচয় গোপন রেখে কথা বলুন – যাতে সে অন্যদের কাছে চিহ্নিত না হয়ে যায়। অন্যরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করার সুযোগ না পায়
- অন্য কোনো ছাত্রছাত্রী বা কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা সমস্যাক্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীর সমস্যা নিয়ে যেন ব্যঙ্গ না করেন এবং অমানবিক আচরণ না করেন – সে বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন
- নেতিবাচক সমালোচনা কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর আত্মপ্রত্যয়কে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, বিশেষ করে সমস্যাক্লিষ্ট মুহূর্তে। এ বিষয়ে সংচেতন থাকুন। নিজের নীতিবোধ বা ন্যায়-অন্যায়বোধ দিয়ে সমস্যাকে না দেখে ছাত্র বা ছাত্রীটির জায়গায় নিজেকে নিয়ে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন
- ছাত্রছাত্রীর নানা মানসিক সমস্যা সমাধানে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে অভিভাবক/অভিভাবিকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যৌথপ্রয়াস একান্ত কাম্য। পরস্পরের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, ছাত্র বা ছাত্রীর নানান সমস্যা নিয়ে খোলামনে আলোচনা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসবোধের প্রয়োজন
- যদি দেখা যায় সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলছে কিংবা পুনরাবৃত্তি ঘটছে, সেক্ষেত্রে বিলম্ব না করে মনোরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের কোনো আবেগ বা আচরণের সমস্যায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা যা করবেন না

- দুষ্টুমি/বদমায়েসি মনে করে মারধোর করা
- সমস্যা নিয়ে ছাত্রছাত্রীর কথা শুনতে বসে শুধু পরামর্শ দেওয়া বা জ্ঞান দেওয়া
- একজনের সমস্যা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে প্রকাশ্যে আলোচনা করা
- সমস্যাটিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব না দেওয়া।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কার্যক্রম

রেফারাল কার্ড

বিদ্যালয় ....

উপকেন্দ্র ....

প্রাথমিক-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ....

চক্র .... ব্লক .... জেলা................................

শিশুর নাম ....

পিতার/মাতার নাম ....

বয়স .... লিঙ্গ .... উচ্চতা .... ওজন .... শ্রেণী .... ক্রমিক নং ....

ঠিকানা ....

....

যে সব কারণে শিশুদের চিকিৎসকের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে ঃ

রক্তাল্পতা আন্ত্রিক কৃমি রাতকানারোগ খোস-পাঁচড়া

পাইওডারমা (পুঁজবিশিষ্ট ফোড়া) কর্ণক্ষরণ চোখ দাঁত ও অন্যান্য

রেফারালের তারিখ ঃ

বিদ্যালয় শিক্ষকের দ্বারা প্রদেয় চিকিৎসা/এ.এন.এম.

চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা / প্রাপ্ত তথ্য

রোগ নির্ণয়

নির্দেশিত চিকিৎসা

চিকিৎসা কতদিন চলবে

কোনো শিশুকে যদি স্বাস্থ্য পরিষেবা বা চিকিৎসকের আওতায় আনা হয় তবে তাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যপরীক্ষার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

যেসব বিশিষ্ট উপদেষ্টা এবং প্রশিক্ষণ সম্ভার প্রস্তুতি বিষয়ক কর্মশালায়/বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবৃন্দের অংশগ্রহণ ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে এই সম্ভারটি বা মডিউলটি প্রণীত হয়েছে তাঁদের নামের তালিকা এখানে প্রদত্ত হলঃ

১। ডাঃ অমিয়কুমার হাটি	প্রাক্তন অধিকর্তা, স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন, কলকাতা
২। ডাঃ হিরন্ময় মুখার্জী	অধিকর্তা, স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন, কলকাতা
৩। ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিন্‌হা	সহঃ অধিকর্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা (বিদ্যালয় স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৪। ডাঃ সন্দীপকুমার রায়	অধ্যাপক, কমিউনিটি মেডিসিন, কলকাতা মেডিকেল কলেজ
৫। ডাঃ মধুমিতা দুবে	অধ্যাপিকা, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ্ এন্ড হাইজিন,কলকাতা
৬। শ্রী জ্ঞানপ্রকাশ পোদ্দার	অধিকর্তা, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, কলকাতা
৭। শ্রী রথীন্দ্রনাথ দে	অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
৮। অধ্যাপক সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
৯। শ্রী তরুণকুমার মাইতি	ম্যানেজার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী হেলথ অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা
১০। শ্রী আমিনুল আহাসান	ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী হেলথ অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা
১১। শ্রীমতী পূর্ণিমা রায়চৌধুরী	পাবলিক হেলথ নার্সিং স্টাফ, পশ্চিমবঙ্গ
১২। শ্রীমতী শিবানী ধরশর্মা	পাবলিক হেলথ নার্সিং স্টাফ, পশ্চিমবঙ্গ
১৩। শ্রী স্মরণকুমার সরকার	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা
১৪। ডাঃ সত্যজিৎ আশ	মন ফাউন্ডেশন, ভি.আই.পি রোড, কৈখালি, কলকাতা - ৫২
১৫। শ্রীমতী স্মিতা সিং	মন ফাউন্ডেশন, ভি.আই.পি রোড, কৈখালি, কলকাতা - ৫২
১৬। শ্রীমতী স্বাতী মিত্র	মন ফাউন্ডেশন, ভি.আই.পি রোড, কৈখালি, কলকাতা - ৫২
১৭। শ্রী মোহিত রণদীপ	মন ফাউন্ডেশন, ভি.আই.পি রোড, কৈখালি, কলকাতা - ৫২

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ

১। ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ	সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
২। অধ্যাপক স্বপনকুমার সরকার	সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
৩। শ্রী তপন পাল	অর্থ আধিকারিক
৪। শ্রী দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	বিশেষ আধিকারিক
৫। শ্রী সুধাংশুশেখর পয়রা	ওই
৬। শ্রী গোপালরঞ্জন দাস	ওই
৭। শ্রী পশুপতি দাশগুপ্ত	ওই
৮। শ্রী দিবাকর গঙ্গোপাধ্যায়	প্রধান করণিক